আমি বাল ঠাকরে বলছি।



শান্তি দত্ত

আমি বাল ঠাকরে বলছি

(মুম্বই থেকে প্রকাশিত মারাঠী সাপ্তাহিক "মার্মিক"
ও দৈনিক "সামনা"-য় শিবসেনা প্রধান শ্রী বাল ঠাকরের
লিখিত সম্পাদকীয়ের বঙ্গানুবাদ।)

সংকলন ও অনুবাদ

॥ শান্তি দত্ত ॥

স্পেশাল এগ্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মুম্বই

মালবিকা প্রকাশন

মুম্বই-৭৮

Ami Bal Thakerey Balchi
by Shanti Dutta
101, SHIVKRUPA
97, SURYADAY CO.OF.
HSG - SOCIETY
AMBARNATH EAST
DIST - THANE
PIN - 421501
MAHARASHTRA

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
৮ই জানুয়ারী ১৯৯৫

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
১৯শে জুন—১৯৯৫

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ

পঞ্চম মুদ্রণ ঃ

ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ

সপ্তম মুদ্রাণ ঃ
২৬শে মার্চ— ২০০৮
(মলিবিকার জন্মদিন)

পরিবেশক ঃ
মহাজাতি প্রকাশন
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

নিউ বইপত্র
২ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রণ ঃ
আর্কটিক প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১বি, রামকৃষ্ণ দাস লেন
কলিকাতা—৯

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ
বরুণ সাহা

আসিন্ধু সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারত ভূমিকা।
পিতৃভূঃ পূণ্যভূশ্চৈব সয়ৈ 'হিন্দু' রিতি স্মৃতঃ।

বীর সাবরকার

शिवसेनाप्रमुख
'मातोश्री', कलानगर, वांद्रे (पूर्व)
मुंबई-४०००५१
दूरध्वनी : ६४२४४५२

फाळणीच्या वेळी पूर्व बंगाल सोडून येताना
मुसलमान नराधमांकडून मारल्या गेलेल्या हिंदूंच्या
पुण्यस्मृतीस अर्पण.

দেশ বিভাজনের সময় পূর্ব বাংলা থেকে আসার পথে
মুসলমান নরাধমদের হাতে মৃত হিন্দুদের পুণ্য
স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত

शिवसेनाप्रमुख

Thanks

'*Les gens*' of the earth, be it known to you, that I take this opportunity to offer my sincere and innumerable thanks to the Shiv Sena Supremo, beloved and honorable Mr. Bal Thakerey, on this remarkable juncture of translating this book as an effort to revive "Hindutwa" to one of the, politically most sensitive but anaesthetized against the feeling of "Hindutwa", parts of our country.

I objectively mention here that it is a Conjuncture in this part of the land that, any writer in vernacular, speaks of his share of money instantly when approached for a permission to translate his/her published work. But the smiling Mr. Thakerey has instantly refused the honorarium, he has been offered, while seeking his consent to translate his published works and has taken no time to issue me a written permission. In addition, he has spared me his valuable times, out of his very busy schedule of daily work, and has extended his guidence and advice.

May I sincerely be grateful to Mr. Subhas Desai, the perfect Hindu, who won an Assembly Seat in Bombay with a thumping majority but unseated for his strong adherence to "Hindutwa". He is instrumental of my bieng introduced with Mr. Thakerey, besides, helping me to the extent whenever, I have wanted to.

I am indebted to Mr. Sanjay Raut, the executive editor of SAMNA, Mr. Rajen Shellar and others in the editorial department, as I have received all possible help from them including accesses to the old editorials of SAMNA, whenever I have needed.

I must offer my sincere thanks to Mr. Ananta Sawant of Sion, Chunabhatti for his unconditional help in the course of translation work. I have been encouraged to compiled the editorials & transformed into Bengali after going through a work compiled in Marathi, named—"HINDUTWA SAR ANI DHAR", published by Mr. Shashi Bhalekar and Ms. Namrata Muley of Dimple Publications, Naupara, Vasai Road. Shouldn't there be many thanks to them also!

How can I conclude here without mentioning that the heterogeneous compound which comes out of my pen while translating Marathi into Bengali, the man through whom the compound gets filtered, he is none other than the friend Mr. Pronab Das. Would it be enough to offer him thanks?

It is sure and certain that mere THANK does not repay any kind of debt so I remain grateful to all of them, mentioned above.

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

পিশাচহন্ত্রী মা মহাকালীর বরাভয়ধন্যা, অসুরদলনী ত্রিনয়নী মা দুর্গার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রিতা, "সুজলাং সুফলাং মলয়জ"র মত অশ্রুতপূর্ব্ব মাতৃবন্দনায় আপ্লুতা, শষ্যশ্যামলা বাংলা আজ আবার হিন্দুত্ববাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছে, এ অত্যন্ত আনন্দের হলেও, না বলে উপায় নেই যে, এই উপলব্ধি অনেক আগেই আসা উচিত ছিলো, এবং সেই উপলব্ধি সারা হিন্দুস্থানে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব বাংলারই সর্ব্বাগ্রে পালন করা উচিত ছিলো। ইতিহাস তো সেই কথাই বলে।

দেশ বিভাগের আঘাতে, সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও, কেন যে বাংলা এতদিন এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলো, তা বুঝতে পারছিনা।

ইসলামী অত্যাচারের বেদনা যতটা বাংলাকে সহ্য করতে হয়েছে বোধ হয় আর কাউকেই তা করতে হয়নি। সেই নির্ম্মম অত্যাচার, বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের পর ত্রাণ শিবিরে সেই অসহ্য জীবন-যাপনের গ্লানি—মা'এর অপমান, বোনের নিগ্রহ, কি করে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো বাংলা—বাঙালী? কংগ্রেস দাবী করে—তারা নাকি ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। আর, গত ১৭ বছর ধরে যে, লাল ভাইরা বাংলায় রাজত্ব করছে তারা তো ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে, আসলে নিরীশ্বরবাদী-নাস্তিক। তবুও মা মহাকালী, দেবী দুর্গার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নি, প্রতি বছরই এঁদের পূজা, শত বাধা বিপত্তি সত্বেও, ভক্তিপূর্ণ ভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। হিন্দু ধর্ম্মের রীতি-রেওয়াজ এবং ঐতিহ্যকে যথাবিহিত বজায় রেখেই বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ, আজ সারা দেশে স্বমহিমায় বিরাজমান।

শ্রী শান্তি দত্তের কাছ থেকে জানলাম আজ পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৩০% এর বেশী। ~~প্রতিশত ৩০ জনেরও বেশী~~। এই অঙ্ক প্রতিশতর বদলে প্রতি পঞ্চাশে পরিণত হতে বেশী সময় লাগবেনা। তার উপর সীমানাও আবার বাংলাদেশের সাথে যুক্ত। ঐ সীমা পেরিয়ে অনবরত দলে দলে অনুপ্রবেশ ঘটছেই।

হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রনিষ্ঠ কোন শক্তি এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই, কংগ্রেস ও লালভাইরা নিজেদের সমস্ত বিরোধিতা ভুলে, জোট বেঁধে ঐ রাষ্ট্রনিষ্ঠদের খতম করার অভিযান চালাচ্ছে—চালাবে। বাংলার রাজা রামমোহন রায়, ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের 'আশীর্ব্বাদ' বলেছিলেন কেন তার মূল্যায়ন করতে হবে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে, বহুবছরের ইসলামী দখলী শাসনের অবসান করে ইংরেজ গদি দখল করলো। এই বিষয়ে রাজা রায় সাহেব বলেছেন—"হাজার বছরের অঘোষিত গোলাম-গিরির থেকে মুক্ত করে এই দেশকে বৃটিশের অধীনে আনায় বিশ্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।" ধর্ম্ম, সভ্যতা, পরম্পরা, পবিত্র পারিবারিক বন্ধন, ন্যায়, সত্য, মাঙ্গল্য, বাৎসল্য, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও অনেক মহৎ মূল্যবোধ

ধ্বংসকারী, বহু বছরের বর্বর ইসলামী শাসনের অবসান হওয়ায়, রাজা রামমোহন রায়ের আনন্দিত হওয়া ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার বাঙ্গালী ভাইরা, রাজা রায় সাহেবের, আদর্শ ও ইচ্ছাকে সম্মান জানায়নি। দেশ বিভাগের ফলে নরাধম, শয়তানের প্রতিনিধি মুসলমানরা বাঙালী হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করলো, তাদের বাড়ীর মহিলাদের বলাৎকার করলো, লুট-মার-দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, হাজারো বাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের খুন করলো, তাদের ভিটে ছাড়া করে সেই সব সম্পত্তি জোর করে দখল করলো। তবুও বাঙালী হিন্দুদের রক্ত গরম হলো না, তবুও ঐ শয়তানদের বিরুদ্ধে কোন রকম আন্দোলন সংগঠিত হলো না অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির জন্য কত কত মানুষ মৃত্যু বরণ করলো। আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রদর্শক, বিপ্লবী আন্দোলনের উৎস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রান্তির পীঠস্থান সেই বাংলা, স্বামী বিবেকান্দের পৌরুষের ছটায় পৌরুষদীপ্ত—সেই বাংলা ও তার রাজধানী সদা জাগ্রত কলকাতা—হিন্দুত্ববাদ এবং রাষ্ট্রবাদের প্রশ্নে এত পিছিয়ে আছে! কেন? কোন্ অলীক আদর্শের নেশায়? যাইহোক, আশা ও আনন্দের অবকাশ আছেই। আজ, প্রচন্ড হিন্দুত্বের ঢেউ সারা হিন্দুস্থানকে প্লাবিত করছে—বাংলাকেও করছে-আরও করবে। আমি, হিন্দুত্বের যে জ্বলন্ত অঙ্গার শব্দ রূপে পাঠকদের সামনে রাখি, তার কিছু অংশ, আজ বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বাংলার পাঠকদের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে। এতে যদি, বাংলায় হিন্দুত্বের মশাল আরও একটু উজ্জ্বল হয় তা হলে ১৯৪৫ সালে, মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারানো বাঙালী হিন্দু ভাই-বোনেদের আত্মারা শান্তি পাবে। আমিও তৃপ্তি পাবো। লাল ভাইদের তথাকথিত ধর্ম্মনিরপেক্ষতা এবং নিরীশ্বরবাদ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই। প্রখর হিন্দুত্ববাদের গৈরিক রংই হবে বাংলার ভবিষ্যৎ রক্ষাকর্তা। তাই সমস্ত বাঙালী হিন্দু ভাই-বোনেদের কাছে আবেদন করি যে, হিন্দুত্ববাদের আগুন যেন কখনও নিষ্প্রভ না হয়।

বাংলায়, আজ যখন, সমস্ত হিন্দুত্ববিরোধী শক্তি একজোট হচ্ছে, তখন আমার এই জ্বলন্ত হিন্দুত্ববাদী শোচ-বিচার, পুস্তকরূপে প্রকাশ করে, মালবিকা প্রকাশনের কর্ণধার যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, আমার অনুগামী, সমর্থক বাঙালী ভাই বোনেরা, এই পুস্তক সানন্দে গ্রহণ করবেন এবং ঘরে ঘরে পৌছে দেবেন, যাতে প্রতিটি ঘর এক একটি দুর্ভেদ্য হিন্দু দুর্গে পরিণত হয়।

গৈরিক অভিনন্দনান্তে—

জয় পশ্চিমবঙ্গ।

জয় হিন্দ্।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

জাতীয়তাবাদ—জিন্দাবাদ

পাকি .... স্তান—
জিন্দাবাদ।
হিন্দু .... স্থান
মুর্দ্দাবাদ।
লড়কে লিয়া পাকিস্তান—
হঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।

উৎস—চাঁদ তারা খচিত অসংখ্য সবুজ পতাকা শোভিত বিশাল মিছিল।

স্থান—"মিনি পাকিস্তান" নামে পরিচিত, মুম্বই এর ভেন্ডিবাজার এলাকা।

কাল—দিনের প্রথম ভাগ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২, যার কয়েক ঘন্টা আগেই B.B.C.-র Mark Tully এবং C.N.N. এর কৃপায়, সারা হিন্দুস্থানতো বটেই—সারা পৃথিবী জেনে গেছে, উত্তর প্রদেশে অর্ধ শতাব্দি ধরে বর্জিত এবং গায়ের জোরে বিতর্কিত করে তোলা এক বাস্তু, কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ভেঙে ফেলেছে।

নেপথ্যের পাত্রগণ—সেক্যুলারিজমে যারা ছুন্নৎ করেছে। গদিতে টিঁকে থাকার লোভে ভোটের লালসায় যারা বহুদিন আগে গণতন্ত্রকে খাসিতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।

তাদের প্রতিক্রিয়া—ইতিমধ্যে হিন্দুস্থানের সমস্ত নদীনালা তাদের চোখের জলে ভরে গেছে, তবুও প্রক্রিয়া অব্যাহত—কে আরও কত ভর্ৎসনাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে—আরও কত অঝোরে চোখের জল ফেলতে পারে!

সাধারণ পাত্রগণ ও
তাদের প্রতিক্রিয়া—কালের ঐ ভাগেই, এই সংকলক ও অনুবাদক স্থানের ঐ ভাগেই, উপরিউক্ত Slogan শুনতে শুনতে B.E.S.T. বাসের দোতলায় অন্য অনেক সহযাত্রীদের (সম্ভবতঃ তাদের বেশীর ভাগই সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ) সাথে বসে, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর সাথে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলাম, আর মনে মনে হিসাব করছিলাম ঐ দোতলা বাসের আরও কতক্ষণ সময় লাগবে এই এলাকা পার হতে?

ভেবেছিলাম এই ভাবেই সংকলক তথা অনুবাদকের কথা পরিবেশন করব। কিন্তু যতই এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে লেখায় নাটকের আদল এসে যাচ্ছে। অথচ আমিতো কল্পনাধর্ম্মী কোন নাটক লিখতে বসিনি। লিখতে চেষ্টা করছি—কিছু কথা—প্রত্যক্ষ্য দর্শন—বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

আমার জন্ম তদানীন্তন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কোন এক গ্রামে। হয়তো গাছ-গাছালির ছায়া-পরিবৃতা হয়ে শান্ত নিশ্চিন্ত ছিলো। হয়তো ভোরে পাখির কলরব বেয়ে সূর্য্যের প্রথম রশ্মি পড়তো তার মাটিতে। হয়তো দুপুরের ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক বেয়ে ঝুপ করে হোতো বিকেল, তারপরেই হয়তো বিকেলের বৃন্তে ফুটতো রাত্রি—সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে। ঠাকুমার কোল ঘেঁসে শুয়ে "রাজকুমারী"—"সোনারকাঠি"—"রূপোরকাঠি"-র কথা শুনতে শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তাম।

কখন যেন এলো দুঃসময়—"এলো দস্যুর দল"—এলো মুসলিম লীগ, এলো রাজাকার, এলো মুজাহাদীন—"কাঁটা মারা জুতোর তলায়" ছিন্নভিন্ন করল সেই গ্রাম। ঠাকুমার কাঁধে চেপে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে—আমাদের নূতন নামকরণ হল—"বাস্তুহারা" সে সব দিনের কথা সব আর স্পষ্ট মনে নেই—এই বয়সে থাকার কথাও নয়। পেশাদার লেখক নয় বলে, সে সব দিনের কথা নথিবদ্ধ করে রাখার কথা মনে হয়নি। কিন্তু এ কথা আমি অবশ্যই বলতে পারি যে, উপরিউক্ত শ্লোগান শুনতে শুনতেই আমার শৈশব কেটেছে। শিয়ালদহ স্টেশনে ও পরে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে স্বামীহারা, পুত্রহারা, যুবতী কন্যাহারা নারীদের বুক-ফাটা হাহাকার ভরে ছিলো আমার কৈশোর। সময়ের ব্যবধানে-যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে ঐ Slogan এর সামান্য বদল হয়েছে। আগে বলা হত "হঁসকে লিয়া পাকিস্তান—লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান"—এখন বলা হয় "লড়কে লিয়া পাকিস্তান, হঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান"। তখনও ওরা মারতো, হিন্দুরা মার খেতো, এখনও মার খায় হিন্দুরাই। তখনও সরকার আর পুলিশ থাকতো ওদের পক্ষে, এখনও থাকে। তখন সরকার ওদের সমর্থন দিত কারণ ওরা ছিল সংখ্যালঘু আর এখনও সরকার ওদের পৃষ্ঠপোষণ করে কারণ ওরা সংখ্যালঘু। আবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সরকার ও পুলিশ থাকে ওদের সমর্থনে কারণ—কারণ ওরা সংখ্যাগুরু। অবশ্য হিন্দুস্থানেও সংখ্যাগুরু হতে আর বেশী দেরী নেই। তখনও ওরা মারবে কারণ ওরা সংখ্যাগুরু।

আর একদল ওদের সমর্থন করেন তারা হলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায় কে কত বেশী সমর্থন দিতে পারে তাহলে ভোটের সময় তারা তত বেশী ভোট চাইতে পারবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে থাকাকালীন, রোজই কোন না কোন মহিলার কান্নায় ঘুম ভেঙে যেতো। কেউ স্বামীহারা, কেউ পুত্রহারা। কারো যুবতী মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেছে, কারো ছেলের বউকে। তখন বোঝবার মত বয়স ছিল না। কিন্তু কান্না

আর থমথমে ভাব দেখে চুপ করে থাকতাম। বড় হওয়ার পরের একদিনের ঘটনা মনে পরে, একজন মহিলার যুবতী কন্যাকে তার সামনেই বলাৎকার করে ও জোর করে নিয়ে যায়। মহিলা কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে এপারে চলে আসেন। মহিলা মাঝে মাঝেই পুরানো কথা মনে করে কাঁদতেন। এখানেও মুসলিম তুষ্টিকরণের বহর দেখে ("মুসলিম তুষ্টিকরণ", এ কথাটায় আবার কিছু লোকের গায়ে ফোস্কা পড়ে। এই কথাটা নাকি কট্টরবাদী হিন্দুদের আমদানী।) মহিলা একদিন প্রশ্ন করেন—"এই যে ব্যাডারা মুসলমানগ অইয়া কথা কয় অগ কি বউ, মাইয়া নাই? হ্যাগ একটারে ধইরা লইয়া গ্যালে অরা কি করত?" অন্য একজন জবাব দিলেন—"মাসী কইয় না—ভোটের লইগ্যা অরা সব পারে, দারকার অইলে নিজেগ বউ, মাইয়া ....।" না, আর লিখছিনা, আর লেখায় প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। পাঠক বুঝতেই পারছেন, এ ধরনের কথা বাসে ট্রামে অহরহ শুনেও থাকেন নিশ্চয়ই।

আর একদল থাকেন ওদের সমর্থনে, তাদের সংখ্যাটা আবার পশ্চিমবঙ্গেই বেশী। তাঁরা সমাজে বুদ্ধিজীবি নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ সরকার কিংবা কোন বড় সেঠিয়ার অনুগ্রহে কলম চালিয়ে পেট ভরেন। এইরকম এক বুদ্ধিজীবির বুদ্ধির দৌড় কিছুদিন আগে নজরে পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্যাদেবী ও হিন্দু বাঙ্গালীদের মাতৃস্থানীয়া পরম পূজনীয়া 'কালীমাতা' কে "ল্যাংটা সাঁওতাল মাগী" বলে ভর্ৎসনা করেছেন। বাংলা সংসদ ডিক্‌শেনারীতে বুদ্ধিজীবি শব্দের অর্থ—'বুদ্ধিবলে বা বুদ্ধির কাজ দ্বারা জীবিকার্জনকারী"। জীবিকার্জনের জন্য অর্থাৎ পেটের দায়ে অনেকেই অনেক কিছু করে থাকেন এমনকি দেহ বিক্রি পর্যন্ত। এই বুদ্ধিজীবি মশায়ও পেটের দায়ে হিন্দু বাঙ্গালীদের মাতৃস্থানীয়া (আর বুদ্ধিজীবি মশায়ের উপাধি যখন গঙ্গোপাধ্যায় তখন মনে হয় হয়তো উনিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তানই হবেন, যদি তাই হয় তাহলে তারও মাতৃস্থানীয়া)—কালীমাতাকে, অর্থাৎ তার নিজের মাতাকেই ভর্ৎসনা করলেন। যেমন—আরো অনেকে হিন্দু, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে যা খুশী লেখেন—পেট্রো ডলারের লোভে। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—কামাতুরানাম ন ভয়ং ন লজ্জা। এদের জন্য এটাকে একটু পরিবর্তন করে বলা যায়—ধনাতুরানাম ন ভয়ং ন লজ্জা। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই দেখে যে এধরনের লেখা লিখেও সেই মানুষ কলকাতা শহরে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে! একে কি সহিষ্ণুতা বলব? এই সব তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের বলছি—সাহস থাকে তো অন্য ধর্মের সমালোচনা করে দেখাক। আসলে হিন্দুদের আসল শত্রু এই সব হিন্দুরাই, এরা কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে, কেউ ভোটের লোভে, কেউ আবার মহামানব কিংবা মহাত্মা হবার বাসনায় হিন্দু বিরোধিতা করে।

এ ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকা কিন্তু স্পষ্ট, ওরা ওদের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থকেই শ্রদ্ধা ও অনুকরণ করে। কোরানে লেখা আছে—'আদুব্বুল্লিল কা-ফিরীন' মানে আল্লাহ অবশ্যই কাফেরদের (অমুসলমানদের) দুশমন। (ছুরা বাক্কারাহ ; পারা-১, আয়াত-৯৮) হারাম মাসগুলি অতিবাহিত হইয়া গেলে মুসরিক (যারা অনেক দেব-দেবীতে বিশ্বাসী) দিগকে হত্যা করিবে, বন্দী করিবে এবং করিবে তা দিগে অবরোধ, অনন্তর যদি তওবাহ্ করে, (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যায়) নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয় তবে ছাড়িয়া দিবে। (ছুরা-তওবাহ, পারা-১০, আয়াত-৫) তোমরা কাফেরদের মোকাবিলা কালীন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। যখন ওদের তোমরা সম্পূর্ণ পরাজিত করিবে তখন মজবুত করিয়া বাঁধিবে, পরে তোমরা ইচ্ছা করিলে মুক্তি দিতে পার কিংবা মুক্তিপণ আদায় করিয়া ছাড়িতে পার। (ছুরা-মুহাম্মদ, পারা-২৬, আয়াত-৪) হে মুসলমানগণ, ইহুদী, ইসাই আর মুসরিকদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিওনা। তোমাদের মধ্যে যে ওদের বন্ধু করিবে সে ওদেরই মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহ কখনো জালেমদের পথ দেখান না। (ছুরা-মা-ইদাহ, পারা-৬, আয়াত-৫১) হে মুসলমানগণ। কাফেরদের অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ কর যতদিন পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় অমুসলমান থাকে আর আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীক ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়। (ছুরা-আনফা-ল, পারা-৯, আয়াত-৩৯) হে মুসলমানগণ। যুদ্ধে তোমাদের হাতে মৃত সেই কাফেরদের স্ত্রী তোমাদের জন্য বৈধ। (ছুরা-আন্নিছা, পারা-৪, আয়াত-২৪)

তাই মুসলমানরা কোরানের আদেশ মত হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে, লুটপাট করে বলাৎকার করে ; পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে!

কিন্তু হিন্দুরা কি হিন্দুস্থানে, নিজেদের দেশেও মার খাবে? কেউ কি নেই হিন্দুদের হয়ে কিছু বলে, কিছু লেখে? সবাই কি ভোটের রাজনীতিতে ব্যস্ত? বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি একজনকে যিনি মুম্বই শহরে বসে হিন্দুদের জন্য কিছু বলছেন, কিছু লিখছেন। কংগ্রেস থেকে শুরু করে অন্য সব দলগুলি তাকে ধর্মান্ধ, মৌল দী বলে গালাগালি দিচ্ছে! সত্যিই কি তিনি ধর্মান্ধ? সত্যিই কি তিনি মৌলবাদী? আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করছিনা, বিগত দশ বছরের খবরের কাগজে তাঁর কয়েকটা লেখা বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করে পাঠকদের সামনে রাখছি।

এই বই সংকলন বা অনুবাদ করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না ; আজ মুম্বই শহরে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী বসবাস করছে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্বর্ণকার কিংবা ঐ ব্যবসার সাথে জড়িত। এদের কর্মকেন্দ্রও সেই 'মিনি পাকিস্তানের' মাঝখানে। ১৯৯২ এর ডিসেম্বর ও ৯৩ এর জানুয়ারীতে মুসলমানরা যে ভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু করল এবং প্যান্ট খুলে দেখে দেখে হিন্দুদের হত্যা করতে লাগলো,

সেই দাঙ্গায় এদের লোকসান হলেও তত লোকসান হয়নি। এই দাঙ্গার হাত থেকে এদের বাঁচিয়ে ছিল একটা মাত্র নাম—শ্রী বাল ঠাকরে! তাই আজ এরা বলেন— 'যদি এই লোকটা না থাকতেন? কোথায় থাকতাম আমরা, হিন্দুরা?' এরা আরও বলেন "মার এর বদলে মার দেওয়া হয়েছিল বলেই আজ আমরা আত্মসম্মান বাঁচিয়ে কাজ করতে পারছি। আজ কেউ আমাদের উপর 'দাদা গিরি' করার সাহস পাচ্ছে না। অথচ পশ্চিমবাংলায় কত অপপ্রচার হচ্ছে এর নামে!" ওরা কয়েকজন আমাকে অনুরোধ করলেন 'আপনি আমাদের হয়ে ওনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানান'।— তাই আমি তাঁরই লেখা অনুবাদ করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দিয়ে তাঁকে চিনবার, জানবার পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। পাঠকরা বিচার করুন আর রায় দিন—মৌলবাদী কে? ধর্মান্ধ কারা?

আমার পূর্ববর্তী বই মহাজাতি প্রকাশনের "গান্ধী হত্যা কেন?" পড়ে অনেকেই আমাকে পত্র পাঠিয়েছেন। শ্রীমতি নীতা চক্রবর্তী নাম্নী জনৈকা পাঠিকা লিখেছেন "আমরা যারা বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা পড়তে পারিনা এধরনের লেখা বাংলায় পড়তে পেরে তারা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।" তিনি আরও লিখেছেন "ইচ্ছে হচ্ছে আপনার বই এর কয়েক হাজার কপি ছাপাই ও লোকের বাড়ি বাড়ি বিলি করি।" পাঠক পাঠিকাদের এধরনের মতামতই আমাকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, এধরনের লেখা অনুবাদ করে তাঁদের হাতে তুলে দিতে। আমি জানি এই বই প্রকাশ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহল ও বুদ্ধিজীবিরা আমাকেও মৌলবাদী আখ্যা দেবে। ছোটবেলা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সাথে আমি জড়িত। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কলকাতা শহরের ট্রাম, বাসের ধ্বংসকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি, বামপন্থী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে ছাত্রাবস্থাতেই একাধিকবার জেলও খেটেছি। এক নাগাড়ে যতদিন আমি জেল খেটেছি বর্তমানে গদীতে আসীন কোন বামপন্থী নেতা ততদিন খাটেননি, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও না। কিন্তু কি পেলাম? আমার ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথা বলছি না।—(প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, নিজের জন্য ডাল-ভাতের যোগাড় অনায়াসে করে থাকি।) কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কি পেলো? বেকার সমস্যা কতটা দূর হল? কজনের রোজগার জুটলো? (অবশ্য কিছু পার্টি কমরেডদের জুটেছে, পার্টির ছত্রছায়ায় থেকে পাড়ার মস্তানি আর নানা অজুহাতে চাঁদা আদায় করে তাদের বেশ চলে যাচ্ছে।) গুন্ডা, বদমাস, সাট্টা বাজারী এদের সাথে মন্ত্রীমন্ডলের সম্পর্ক কার অজানা? কলকাতার ট্রাম, বাস ভাড়া আর বাড়ছে নাতো, গণআন্দোলনে আর গুলি চলছে না? ভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিকদল ও কর্মীদের উপর আর হামলা হচ্ছেনা? জানি, সবাই এক কথাই বলছে—পশ্চিমবঙ্গ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। কংগ্রেসের

মুনাফাখোর পোষণকারী আর মোহনদাস গান্ধীর মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতিই পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গেছে। আর—আর মার্কসবাদ ও সুভাষবাদের নাম করে যে 'উলঙ্গ নৃত্য' পশ্চিমবঙ্গে চলছে দেখে মনে হয় যদি কার্ল মার্কস আর সুভাষ বসু বেঁচে থাকতেন তাহলে হয় এদের গুলি করে মারতেন না হয় তাঁরা নিজেরা আত্মহত্যা করতেন।

এসব দেখে শুনে একটা সিদ্ধান্তই নিতে হচ্ছে—পুঁজিবাদ?—সমাজবাদ?—সুভাষবাদ?—সাম্যবাদ?—

সবার আগে জাতীয়তা বাদ (NATIONALISM) কিন্তু যারা বলে 'আগে ধর্ম পরে দেশ' তাদের কি জাতীয়তাবাদী বলব?

কক্ষনো না—কারণ, স্বধর্মীয় অন্য কোন দেশের সাথে হিন্দুস্থানের বিবাদ হলে 'ধর্ম রক্ষার্থে' তারা হিন্দুস্থানের বিরোধিতা করবেই একথা তারা স্বীকারই করছে, তাই তারা দেশদ্রোহী—দেশদ্রোহীদের এদেশ থেকে তাড়াতেই হবে। তাই আসুন সবাই মিলে সোচ্চারে বলি—জাতীয়তাবাদ বিরোধীরা ধ্বংস হোক।

জাতীয়তাবাদ—

জিন্দাবাদ্।

শান্তি দত্ত
স্পেশাল এগ্জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মুম্বই
এ/৭ চোপড়া চাল
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ
ভান্ডুপ-মুম্বই-৪০০ ০৭৮



ভাষণরত মাননীয় শ্রী বাল ঠাকরে।

"সামনা"—ছয়ই ডিসেম্বর ১৯৯৩

ছয়ই ডিসেম্বর শুভদিন—বিজয়োৎসবের দিন

একটার পর একটা দিন চলে গেলো। মাসের পর মাস। ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠাগুলি একটার পর একটা উল্টে গেলো। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, বারোমাস —এক বছর! এই একটা বছর এমন ভাবে গেলো মনে হচ্ছে যেন আজই সেই দিন—ছয়ই ডিসেম্বর, ১৯৯২। ছয়ই ডিসেম্বর, হিন্দুদের জন্য এক শুভদিন—আনন্দের দিন—বিজয়োৎসব পালন করার দিন। হিন্দু যোদ্ধাদের হাতুড়ির ঘায়ে হিন্দু জাতির বুকের কলঙ্কের দাগ—বাবরি বাস্তু ধূলিতে মিলিয়ে গেলো। আজই সেই ছয়ই ডিসেম্বর। আযোধ্যার কুরুক্ষেত্রে লাখো হিন্দু যোদ্ধাদের বিজয়ে খুশী হয়ে স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতারাও হিন্দুস্থানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করল, সেই দিবস আজই—এই ছয়ই ডিসেম্বর। অত্যাচারী মুসলমান সুলতানদের ঔদ্ধত্য ধূলিতে মিলিয়ে গেলো—এই সেই দিন। দেশদ্রোহী মুসলমানদের যথেচ্চাচারকে উৎসাহিত করে নিজেদের রাজকীয় স্বার্থ সিদ্ধিতে রত সত্ত্বাধিষ্ঠিত ও অন্য রাজকীয় নেতাদের, প্রচন্ড হিন্দুশক্তি যে দিন সমুচিত শিক্ষা দিলো সেই দিন আজই—ছয়ই ডিসেম্বর। ছয়ই ডিসেম্বর এখন থেকে এক হিন্দু উৎসবের দিন বলে গণ্য করা হবে ; শ্রেষ্ঠ উৎসব—আনন্দময় উৎসব। আমি শুধু আশাই করছিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে রাজনৈতিক দলগুলি ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিরাও এর থেকে নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অন্যায় অত্যাচার ও উপেক্ষার সীমা আছে। "রাম জন্মভূমি" বিষয়ে হিন্দুদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হিন্দুরা আর কত দিন সহ্য করবে? কতদিন অপেক্ষা করবে? আর কার মুখ চেয়ে? কার ভরসায়? রাও সরকার ও মেকি সেক্যুলারবাদীরা এই বিষয়ে মুসলমানদের যে খোশামোদ শুরু করেছিল তারই পরিণাম হচ্ছে ছয়ই ডিসেম্বরের ঘটনা। তাই বির্তকিত বাস্তু ভাঙায় না কোন দুঃখ, না কোন অনুশোচনা। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে পনেরই আগষ্ট যেমন মহত্ত্বপূর্ণ দিন তেমনি অবিস্মরণীয় দিন এই ছয়ই ডিসেম্বর। পনেরই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল সত্য কিন্তু হিন্দুরা মুসলিম তুষ্টিকরণকারী রাজনৈতিক নেতাদের শিকার হল, তাদের জোয়ালে আটকে পড়লো। সেই জোয়াল থেকে হিন্দুরা মুক্তি পেলো ছয়ই ডিসেম্বর, তাই এ বিজয়ের দিন—পরবের দিন।

কারো কারো মতে গত ছয়ই ডিসেম্বরের সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা, হত্যাকান্ড এ ছিল বাবরি স্থাপত্য ভাঙার প্রতিক্রিয়া। যা হবার তাতো হয়েই গেছে, কিন্তু পুলিশি তদন্ত এখনও চালু আছে। তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত করা হয়েছে।

আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাদের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দাঙ্গা শুরু করেছিল। এ ছিল ভবিষ্যতে বড় কিছু করার প্রস্তুতি এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু ওদের পরীক্ষা অসফল হ'ল। হিন্দুদের বিশেষ করে শিবসৈনিকদের সতর্কতা ও তৎপরতার জন্য এই পরিকল্পিত দাঙ্গা ধর্মান্ধ মুসলমানদের খেলাপেই গেল। তাদের সাথে মোকাবিলা করার মত এক শক্তি এই দেশে বিশেষ করে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মহারাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে এই কথা তারা সেদিন বুঝতে পারলো। তাই অসংখ্য হিন্দুদের প্রাণ রক্ষা হ'ল। শিবসেনার নাম শুনলেই যারা জ্বলে পুড়ে মরে তারাও আজ প্রকাশ্যে না হোক অপ্রকাশ্যে স্বীকার করছে এবং বলে বেড়াচ্ছে যে শিবসেনা ও শিবসৈনিক না থাকলে, তারা সক্রিয় প্রতিরোধ না করলে মোগল আমলে যে রকম হিন্দুদের 'কোতল' করা হতো, সেই রকম 'কোতল' এবারও হতো। মুম্বই-এ বসবাসকারী মারাঠী ছাড়া অন্য প্রান্তের লোকেরাও একই কথা বলছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি আমাদের দেশের সরকার, তাদের মুসলিম তুষ্টিকরণ কর্মপদ্ধতিতে। "দাঙ্গা বাধালে গুলি চালাও" আদেশ দেওয়ার অপরাধে (?) পুলিশ কমিশনার শ্রী বাপট দন্ডিত হলেন। দাঙ্গাকারী যেহেতু মুসলমান তাই তাদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর আদেশ দেওয়া এক "প্রচন্ড অপরাধ" বলে গণ্য হল। হিন্দু মরুক কিন্তু মুসলমান যেন না মরে, তাদের যেন কোন ক্ষতি না হয় এ হচ্ছে সরকার, সত্বাধারী পক্ষ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অভিপ্রায়। ডিসেম্বরের দাঙ্গায় হিন্দুই বেশী মারা গেছে, কিন্তু কেন?—এ বিচার কেউ করছেনা, কারণ আমাদের সরকারের নীতি হচ্ছে সম্পূর্ণ হিন্দু-বিরোধী। তাদের, দেশের চেয়েও মুসলমানদের চিন্তা বেশী। মুসলমান মরলে অন্য দেশ কি বলবে? বিশেষ করে আমেরিকা কি বলবে? আর ঐ (তুচ্ছ) ইন্টার ন্যাশনাল অ্যামনেষ্টী কি বলবে, এই হচ্ছে তাদের চিন্তা, এ অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। ডিসেম্বরের দাঙ্গায় অসতর্ক হিন্দুরা প্রাণ হারালো, তাদের সর্বনাশ হলো এ ব্যাপারে সরকার ভাবছেনা কিন্তু জানুয়ারীর দাঙ্গায় ধর্মান্ধ মুসলমানদের কেন ক্ষতি হল, তারা কেন মারা পড়ল এই চিন্তায় তাদের ঘুম হচ্ছেনা। পুলিশদের মনে হয় অলিখিত নির্দেশ ছিল 'মুসলমানদের উপর গুলি চালিও না'। খান ও গফুর নামক দুই পুলিশ অধিকারী তো ধর্মান্ধ মুসলমানদের রক্ষার ঠিকা নিয়ে হিন্দু বস্তিতে গিয়ে হিন্দুদের উপর জঘন্য, চরম অত্যাচার করছিল। আইন রক্ষার জন্য সরকারের দেওয়া অস্ত্র তারা হিন্দু-হত্যাযজ্ঞে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করল—মনে হচ্ছিল যেন তারা সরকারী আদেশ পেয়েছে "হিন্দুদের মারো, হিন্দুদের নাম শেষ করো"। ঐ মুসলমান পুলিশ অধিকারীদের তান্ডব-নৃত্য থামাবার মত সাহস ও ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী ও দিল্লি থেকে পাঠানো খাস দূত প্রতিরক্ষামন্ত্রী শরৎ পাওয়ারেরও ছিল না। মুম্বইর সমস্ত মানুষ একটা কথা সেদিন স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে তা হল—কে, কার আপনজন।

শুনলাম মুম্বইর মিনি পাকিস্তান ভেন্ডি বাজারে মুসলমানদের বাচ্চারা দুধ পাচ্ছে না শুনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শরৎ পাওয়ার নাকি অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করছিল। কোন রকমে কান্না থামিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভেন্ডি বাজারে দুধের গাড়ী ও টেম্পো ভরে বিরিয়ানী পাঠালেন। সরকারী দুধ ও বিরিয়ানী খেয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার হিন্দু-হত্যাকান্ড শুরু করল। মনে হয় কংগ্রেস ও জনতাদলের নেতাদের বাবা, মা-এরা পাকিস্তান, ইরান অথবা আফগানিস্থানে 'হনিমুন' করেছিলো আর মক্কায় তাদের সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলো। পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম দেশেও মুসলমানদের এত তোষামোদ করা হয় না। আর এত তোষামোদ করেও প্রতিফল কি? সমস্ত মুসলিম দেশগুলি সব সময় হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধেই। অথচ আমাদের বৃহন্নলা সরকার তাদের সামনে সব সময় নত মস্তক হচ্ছে!

অধিক মুসলমান মারা গেছে বলেই তদন্ত কমিশন বসানো হল, কিন্তু মার্চ মাসে মুসলমানরা যে একদিনে বারো জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো সেই বোমা বিস্ফোরণ তো বেছে বেছে হিন্দু এলাকাতেই ঘটানো হয়েছিল আর তাতে মারাও গেছে সব হিন্দুরাই—কই কোন তদন্ত কমিশনতো বসানো হল না! 'পরিস্থিতি আয়ত্বে' বলে সাধারণ মানুষকে যতই বোকা বানাবার চেষ্টা করা হোক না কেন সরকার এখানেও মুসলমানদের সামনে নত মস্তক হল। হজরতবাল এর অবস্থাও একই রকম, রোজ এক একজন করে আতঙ্কবাদী ছাড়া পাচ্ছে অথচ সরকার 'জিতেছি' 'জিতেছি' বলে হাঁটুর উপর ধুতি তুলে নাচছে! সম্পূর্ণ দেশে মুসলমানরা যখন এই রকম তান্ডব নৃত্য চালাচ্ছে তখন তাদের উপর কোনরকম ব্যবস্থা না নিয়ে আমাদের এই নপুংসক সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখার জন্য হিন্দুদের চোখ রাঙিয়ে বলছে 'আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে ভালো হবে না'। আসলে দেশের মানুষের সামনেও আজ একই প্রশ্ন—আইন শৃঙ্খলা আজ কাদের হাতে? দেশের আইন শৃঙ্খলা আজ না তো সরকারের হাতে না দেশের জনতার হাতে, দেশের সর্বত্র পাকগুপ্তচর আই, এস, আই তাদের ভয়ংকর জাল বিছিয়েছে। তারা চাইছে হিন্দুস্থানে আরেকবার বিভাজন ঘটাতে। এদেশে এমন সরকার কোন দিন কি হবে না যে সরকার পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করবে—"দেশদ্রোহী কাজ করলে গুলি করে হত্যা করা হবে।' চুলোয় যাক্ অহিংসা নীতি। দেশের ভালোর জন্য এ রকম অপ্রিয় ও কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হবে। কিন্তু তা হবার নয়। কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মেয়েকে অপহরণ করার পরই মন্ত্রীদের আইন শৃঙ্খলার কথা মনে পড়বে ও দেশের প্রতি প্রেমের উদয় হবে। আত্মীয়স্বজন বিপদে পড়লে তবেই এদের আইন শৃঙ্খলার কথা মনে পড়ে, অথচ আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে সম্পূর্ণ দেশ যখন বিপদের সম্মুখীন তখন এদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কথা মনে পড়েনা।

ছয়ই ডিসেম্বর হিন্দুস্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হবে। হিন্দুরা রক্তরঞ্জিত হয়ে ঐ দিন বিজয় প্রাপ্ত করেছে। ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী হতে গেলে রক্ত-অভিষেক অনিবার্য্য। "ভবিষ্যতে হিন্দুরা আর মার খাবে না"—"প্রতিশোধ নেবে"—ছয়ই ডিসেম্বরের ঘটনা সমস্ত পৃথিবীকে এই সন্দেশই দিল। কিন্তু তার সাথে সাথে আরও একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বলে রাখছি—হিন্দুর এই রক্তে স্বার্থান্বেষী রাজনীতি যেন না হয়। রাষ্ট্র ও ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই রক্ত-অভিষেক। হিন্দু বাঁচলে তবেই—শুধু তবেই দেশ বাঁচবে। ছয়ই ডিসেম্বর সার্থক হবে। ধর্মযুদ্ধে মৃত শহীদদের আত্মা শান্তি লাভ করবে। আজ এক বৎসর পূর্ণ হল। সেই ঐতিহ্যময় শুভদিনটিকে নমস্কার জানাই। শহীদদের জানাই শতকোটি প্রণাম।

জয়হিন্দ্।

যারা 'বেদ' এর অনুগামী তাদের যেমন বৈদিক বলা হয়—বুদ্ধ, এই নামের জন্যই, অনুগামীদের যেমন বৌদ্ধ বলা হয়, জিন মতের অনুগামীদের জৈন। বিষ্ণুদেবতার উপাসকদের বৈষ্ণব, সেইরকম 'হিন্দু' এই নাম কোন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বা ধর্ম সংস্থাপকের নাম অনুযায়ী বা কোন ধর্মমত অনুসারে উৎপন্ন হয়নি। আসিন্ধু বা সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ভূভাগ, এই দেশের নাম ও তার সাথে সাথে তার ধর্ম ও সংস্কৃতির নাম "সিন্ধু" "হিন্দু" হয়েছে।

বীর সাবরকার

"সামনা"—ছয়ই আগস্ট ১৯৯৪

কংগ্রেস রাজত্ব মানেই বৃহন্নলাদের নৃত্যানুষ্ঠান

মুম্বই পৌরসভার জনৈকা কংগ্রেসী সদস্যা দাবী জানিয়েছেন যে পৌরসভায় শতকরা দুইটি পদ হিজড়াদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক্। এ বিষয়ে অন্যান্যদের মত কি তা এখনও জানা যায়নি তবে এতে বোঝা গেল কংগ্রেস দল ওদের প্রতি কত সহানুভূতিশীল। তা হবেই কারণ কংগ্রেস পক্ষ হচ্ছে হিজড়াদেরই পক্ষ। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য ব্যবস্থা কংগ্রেসীদের হাতে—মানে হিজড়াদের হাতেই। তাহলে আবার হিজড়াদের জন্য আলাদা প্রতিনিধি কিংবা সংরক্ষণের দাবী কেন? হিজড়া, না পুরুষ না স্ত্রী। এ হচ্ছে এক প্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। হিজড়াদের ষঢ়ত্ব শারীরিক আর কংগ্রেসের ষঢ়ত্ব মানসিক—যা দূর করা কঠিন। শব্দকোষে হিজড়া শব্দের মানে হচ্ছে "পুরুষ বেশধারী নপুংসক", "ষঢ়" "পরাক্রমহীন মানুষ", ইত্যাদি। এইসব বিশেষণ কংগ্রেসী নেতাদের জন্য একেবারে মানানসই। কংগ্রেসী রাজ্যকর্তাদের কার্য্য পদ্ধতি হিজড়াদের মতই। এক-একজন নেতা, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, লম্বা-চওড়া চেহারা, বাঘের মত আওয়াজ কিন্তু কাজ নপুংসকের। বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেসী নেতারা দিল্লীর হাই কমান্ডের সামনে নব্বই ডিগ্রি কোণে যেভাবে বাঁকে সে কি কোন পৌরুষের কাজ? দেশের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে, তবুও দেশের চরমপন্থীদের, দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা তো কংগ্রেস সরকার করতেই পারে না উপরন্তু নপুংসকের মত দেশদ্রোহী ইয়াসিন মালিকের কাছে নতি স্বীকার করে। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশদ্রোহীরা হিংসাচারের তান্ডব নৃত্য চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। কোথায় বোমা বিস্ফোরণ হয়ে শরীর টুকরো টুকরো হবে। কোথা থেকে চরমপন্থীদের গুলি এসে মাথা ফুটো করে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। নিরাপদ ভাবে বাঁচার প্রতিশ্রুতি যে শাসনকর্তারা দিতে পারে না তাদের হিজড়া ছাড়া আর কি বলা যায়? ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে বলা হত—"কংগ্রেস পার্টিতে ইন্দিরা গান্ধীই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, বাকি সব মহিলা।" আজকের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর। না নর না নারী এইরকম পুরুষ বেশধারী নপুংসক নেতাদের ফৌজ তৈরী হয়েছে গলি থেকে দিল্লি পর্যন্ত। কোন এক সময়ে দিল্লিতে প্রসিদ্ধ নারায়ন দত্ত তিওয়ারীর শ্লোগান এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিওয়ারী এক সময় শ্লোগান দিয়েছিল—"না ম্যায় নর হুঁ, না ম্যায় নারী ; ম্যায়তো সেবক হুঁ, ইন্দিরাজী কা পূজারী।" কংগ্রেসের এই তিওয়ারী সংস্কৃতিকে কি পুরুষোচিত বলা হবে? "আমরা অযোগ্য, আমরা নপুংসক"—একথা কংগ্রেসীরা তাদের উক্তি ও কর্ম্ম দ্বারা অনেকবার প্রমাণ করেছে।

ঐ ছোট্ট একটু দেশ—পাকিস্তান, আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে থাকে। পাকিস্তানের গুপ্তচর বোমা বিস্ফোরণ করে, হিংসাকান্ড করে আমাদের দেশে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব মিনি পাকিস্তান রয়েছে সেখান থেকে দেশদ্রোহী উদ্‌ঘোষ, দেশদ্রোহী কাজ অহরহ হয়। এসব প্রমাণ সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার এইসব বিষাক্ত নাগদের সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার বাঁশি বাজাচ্ছে! তাদের দুধ কলা দিয়ে পুষছে! একি নপুংসকতা নয়? এই দেশদ্রোহীদের তৎক্ষনাৎ গুলি মেরে হত্যা না করে কাশ্মীরে তাদের দলবদ্ধভাবে মুক্তি দেওয়া হয়! হজরতবালের চার পাশের সৈনিকি পাহারা দেশদ্রোহী ইয়াসিন মালিকের মর্জী অনুসারে সরানো হয়! "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" জয়োল্লাস শুনে আমাদের মত রাষ্ট্রপ্রেমীদের কানে গরম সরষের তেল পড়ার মত অসহ্য বেদনা হয় আর এই ষঢ় সরকার সব মুখ বুজে সহ্য করে! 'এর প্রতিকার করতে হবে, অরাজকতার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। দেশদ্রোহীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে'—একথা যে রাষ্ট্রকর্তাদের মনে হয় না, তাদের কি পুরুষ বলতে হবে? কংগ্রেসের নেতারা আজ ভ্রষ্টাচারের পাঁকে নিমজ্জিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে ভষ্টাচার, চাল, গম, প্রভৃতি িত্যি প্রয়োজনীয় বস্তু কেনার সময়ে ভ্রষ্টাচার, এমনকি প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনার সময়ও ভ্রষ্টাচার—সর্বত্র ভ্রষ্টাচারের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই ভ্রষ্টাচারের বিষে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে অসহ্য, অন্ধকারময়। সাধারণ মানুষকে সেই যাতনার, সেই জ্বালার মধ্যে ফেলে রেখে রাষ্ট্র শাসনকর্তারা আবার নতুন শঠতাপূর্ণ সওদা খুঁজছে, নতুন করে আরও শয়তানী কারবার করছে। পুত্রবৎ প্রজার অসহ্য কষ্ট দেখেও যাদের মনে কষ্ট হয় না, প্রজার কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হয় না, পৌরুষত্ব জাগ্রত হয় না। সেই ধোঁকাবাজ কংগ্রেসীরা নপুংসক নয়তো কি? দুই-চারজন পক্ষপাতহীন কংগ্রেসীনেতা যারা এসব দেখেও না দেখার ভান করছে তাঁদের প্রশ্ন করছি তোমরাই বল তোমরা সত্যিই পুরুষ কি? যদি সত্যিই পুরুষ হও তাহলে এইসব ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছোনা কেন? জানি, তা পারবেনা, কারণ নেতা পদ যাবে, বিধায়ক পদ যাবে, পরবর্তী নির্বাচনে আর টিকিট পাবে না—তাই তোমাদের মুখ বন্ধ, চোখ বন্ধ। এই জন্যই আমি কংগ্রেসীদের পুরুষ বেশধারী নপুংসক, ষঢ়, বলে থাকি। এদের নপুংসকত্বের কারবারের বিবরণ যতই বলা হোক, যতই লেখা হোক ফুরোবে না। হিজড়ারা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে, দলবদ্ধভাবে মানুষকে ঘিরে ধরে পয়সা আদায় করে। আর এই কংগ্রেসীরা গুন্ডা, বদমাস, স্মাগ্‌লার, উদ্যোগপতিদের কাছ থেকে বড় অংকের "তোলা" তোলে। শব্দকোষে হিজড়া শব্দের যেসব অর্থ আছে,—তা কংগ্রেসীদের সাথে একবারে মিলে যায় তাই আমি বলি এদেশে হিজড়াদের রাজত্ব চলছে।

এদেশে এক লোককথা প্রচলিত আছে। প্রভু শ্রীরাম চৌদ্দ বছর বনবাসে যাওয়ার জন্য অযোধ্যা ত্যাগকালে লক্ষ্মণ ও সীতা সহ অযোধ্যা নগরীর সীমায় পৌঁছালে, যারা তাঁদের বিদায় জানাতে এসেছিল সেই প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেন "তোমাদের প্রেমে আমি

মুগ্ধ হয়েছি। চৌদ্দ বছর পর আমি পুনরায় অযোধ্যায় ফিরবো, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের এই প্রেমই হবে আমার জীবনের পাথেয়। স্ত্রী, পুরুষগণ এবার তোমরা ফিরে যাও।" এই কথা বলে প্রভু রাম, লক্ষণ ও সীতাসহ যাত্রা শুরু করলেন। অন্যেরাও নিজগৃহে ফিরতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে শ্রীরাম পিছে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন কিছু লোক তখনও দাঁড়িয়েই রয়েছে। প্রভু রামচন্দ্রের মন দুঃখে ভরে এলো। তিনি ফিরে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন—"আমি ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তোমরা ফিরছোনা কেন?" একথা শুনে তাদের মধ্যে একজন বলল—"প্রভু আপনি আমাদের ফিরে যেতে বলেননি।"

"তা কেন? আমি তো সমস্ত স্ত্রী পুরুষদের ফিরে যেতে বললাম।" প্রভু বললেন।

"হ্যাঁ প্রভু, আপনি সমস্ত স্ত্রী পুরুষদের বলেছেন কিন্তু আমরাতো তাদের মধ্যে নয়।"

"তাহলে তোমরা কারা?"

"প্রভু, আমরা হিজড়া। না নর, না নারী। আপনি আমাদের যেতে আজ্ঞা না দিলে আমরা কি করে যাই?

হিজড়াদের এই শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখে প্রভু রামচন্দ্র মুগ্ধ হলেন, বললেন—"তোমাদের এই শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি বর দিচ্ছি একদিন তোমরাই এদেশে রাজত্ব করবে।" হিজড়ারা স্বগৃহে ফিরলো।

হাজারো বছর আগে প্রভু রামচন্দ্রের দেওয়া বর, সাতচল্লিশ বছর আগে সত্যে পরিণত হল। ১৯৪৭ সালের পর সেই কংগ্রেসরূপী হিজড়াদের রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হল। প্রভু রামচন্দ্র যখন "বর" দিয়েছিলেন তখন তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁর "বর" এইভাবে ভ্রষ্টাচার ও ব্যাভিচারের কাজেই ব্যবহার করা হবে!

যাক, আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্য যখন হিজড়াদের হাতে আর হিজড়ারাই চালাচ্ছে তখন আবার আলাদা প্রতিনিধি বা সংরক্ষিত জায়গার দাবী কেন?

শেষন বিরুদ্ধে শরিয়ত

.... ভোটদাতাদের, তাদের নিজেদের ফটো লাগানো ব্যক্তিগত পরিচয় নির্দেশক পত্র (Identity Card) না দেওয়া পর্যন্ত কোন রকম নির্বাচন হবে না বলে মুখ্য নির্বাচন অধিকারী শ্রী শেষন সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় ঘোষণা করেছেন, আর গত কাল মুম্বইতেও তার পুনরুচ্চার করেছেন। এ শুনে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অসন্তুষ্ট হলেও মনে মনে শেষনের চৌদ্দগোষ্ঠীর পিন্ডি চট্কানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই, কারণ শেষনের বক্তব্য সহজ, সরল ও পরিষ্কার। শেষন বলছেন—"স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন নির্বাচন করতে হলে, অপ্রত্যাশিত ও অনুচিৎ ঘটনা এড়ানোর জন্য মতদাতাদের পরিচয় নির্দেশক পত্র দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই।" সরকার খরচের বাহানা করে এড়াতে চাইছে। আবার এদিকে শেষন পরিচয় পত্রের ঘোষণা করার সাথে সাথে অনেক মুসলিম সংগঠন বিরোধ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে পরিচয় পত্রে ফটো লাগাতে হলে মুসলিম মহিলাদেরও ফটো তুলতে হবে, কিন্তু শরিয়ত অনুযায়ী মহিলাদের ফটো তোলা নিষেধ। ফটো তোলা মানেই শরিয়ত অবমাননা করা তাই শেষনকে সরকার ও শরিয়ত এই দুই এর বিরুদ্ধেই লড়তে হবে।

সতর্কী করণ

মৌল্লা মৌলবীরা ধম্‌কি দিয়েছে মুসলিম মহিলাদের জন্য পরিচয় পত্র আবশ্যিক করা হলে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তারা বলছে শরিয়ত আইন অনুযায়ী বোরখা খোলা আর ফটো তোলা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরিচয় পত্র দেওয়ার আইন দেশের সব নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য, এতে জাতি ধর্মের ভেদাভেদ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। জাল মতদান ও অনুচিৎ প্রথা এড়াতে এই আইন অত্যন্ত জরুরী। পরিচয় পত্র যার কাছে থাকবে সেই মতদান করবে, যার কাছে থাকবেনা তাকে মতদান কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ দেশের কল্যানের জন্য যে আইন, মুসলমানরা শরিয়তের দোহাই দিয়ে তার বিরোধ করছে, এই অজুহাতে যে বোরখা সরানো ইসলাম ধর্ম বিরোধী! তার মানে—বোরখা পরে মতদানের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে মত দেবে, সেই বোরখার মধ্যে স্ত্রী আছে না পুরুষ তা বোঝারও উপায় থাকবেনা। বোরখা পরে একজন একাধিক বার এলেও বোঝার উপায় নেই। মুম্বই এর 'মিনি পাকিস্তান' নামে পরিচিত এলাকায় নির্বাচনের সময় এই বোরখার আড়ালের অনেক গন্ডগোল অনেক বার ধরা পড়েছে। আর দেশে যেখানে যেখানে এই মহল্লা আছে সেখানে সেখানে বোরখার আড়ালে এই অপকর্ম আকছার হয়ে থাকে। সরকার মতদাতাদের জন্য পরিচয় পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আর তার জন্য আইন তৈরী করলে সেই আইনে এই কালো বোরখার জন্য ফাঁক

রাখা অনুচিত। এদের ঔদ্ধত্যের বোরখা হটিয়ে এদের প্রমাদযুক্ত মত্ততা থামাতে হবে। এদের পরিষ্কার ভাবে বলে দিতে হবে যারা পরিচয় পত্র না নিয়ে মতদান কেন্দ্রে আসবে—তাদের মতদানের অধিকার থাকবেনা। এদেশে থাকতে হলে এদেশের নিয়ম মানতেই হবে। শ্রী শেষন 'শরিয়ত' নামক এই পাথর রাস্তা থেকে সরিয়ে দেশে 'সমান নাগরিক আইন' চালু করার প্রথম সোপান তৈরী করবে, হিন্দুস্থানের জনতা এই আশা করছে।

ইসলামের নামে উন্মত্ততা শুধু এই হিন্দুস্থানেই চলে। এই মুসলমানদের আজ স্পষ্ট ভাষার সতর্ক করা উচিৎ—এদেশে থাকতে হলে এদেশের আইন কানুন মানতে হবে। এদেশের সরকার মানতে হবে আর এদেশের ন্যায়ালয়ের রায়কেও সম্মান করতে হবে। তুষ্টিকরণ অনেক হয়েছে। এদেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রথমে ভারতীয় ও পরে তার ধর্ম। যারা এ মানতে রাজী নয় তাদের এদেশে থাকার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই, তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাক। শরিয়ত আইনে চলার জন্য তাদের দাবী অনুযায়ী তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দেওয়াই হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তারা সেখানে যায়নি কেন? এখনও যাচ্ছেনা কেন? শরিয়তের নামে যা কিছু 'উলঙ্গ নৃত্য' করার সেখানে গিয়ে করুক, এদেশে নয়। এদেশে বসে যারা পরিচয় পত্রের জন্য বোরখা খুলে ফটো তোলার বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা পাকিস্তানে কি চলছে সেদিকে দেখুক। বেনজীর, এক মুসলিম স্ত্রী বোরখা খুলে ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসছে। কই শরিয়ত ও শরিয়তবাদীরাতো বাধা দিচ্ছেনা? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদাও তো বোরখা পরছেনা, বোরখা ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানেও তো ইসলাম বিরোধ নেই, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কি সত্যিকারের মুসলমান কেউ নেই? সেখানকার সব নাগরিক কি ইসলাম বিরোধী? সেখানে এ সব চুপচাপ মেনে নেওয়া হচ্ছে, যত অন্যায় আবদার শুধু এইদেশে, হিন্দুস্থানে। অন্য সমস্ত মুসলমান দেশগুলি থেকে আজ যখন বোরখা লোপ পাচ্ছে তখন এই হিন্দুস্থানের মুসলমানরা বোরখার আড়ালে অপকর্ম করার দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে। দেশের আইন কানুন পদদলিত করছে। তাই শেষনের এই পদক্ষেপ অভিবাদনযোগ্য, কারণ—দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। মুসলমানরা যদি এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সময় থাকতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ এ নির্ধারণ করতে হবে—শ্রেষ্ঠ কে? শ্রেষ্ঠ কি? আইন কানুন না মুসলমান? সংবিধান না শরিয়ত?

"সামনা"—বারোই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪

ইসলামের চেয়ে দেশ শ্রেষ্ঠ কামাল পাশার দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য

এদেশের ভণ্ড, অধার্মিক সরকার পুনরায় একবার মুসলমানদের সামনে নতজানু হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি শ্রী শেষনের ব্যবহারে। সরকার, যে শেষনের সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল সেই শেষন শরিয়তের সামনে কেন ঝুঁকছে বুঝতে পারছিনা! মতদাতাদের পরিচয় নির্দেশক পত্র দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন আয়োগ অবিচল থাকলেও মুসলিম মহিলাদের পরিচয়পত্রে ফটো লাগাবার নিয়ম শিথিল করা হয়েছে! আশ্চর্য্য! কি চলছে এইদেশে? ধর্মের নামে দেশের সর্বনাশ করার প্রবৃত্তি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বাড়ছে তা চোখে দেখেও প্রতিহত করার চেষ্টাতো দূরের কথা সেই আগুনে আরও ঘি ঢালা হচ্ছে! এ অত্যন্ত বিপজ্জনক। হজরতবাল না হয় রাম জন্মভূমি, শাহাবানু ঘটনা না হয় নির্বাচন আয়োগের নির্ধারিত পরিচয় পত্রের বিষয়, সমান নাগরিক আইন অথবা বন্দেমাতরম্, না হয় জাতীয় সঙ্গীত, প্রত্যেক ব্যাপারে মুসলমানরা ধর্মের দোহাই দিয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে আর সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থাতো নেবেই না বরং; মুসলমানদের সামনে নতজানু হবে। অথচ হিন্দুরা 'হিন্দু' এই শব্দ উচ্চারণ করলেও তাদের ক্ষমা নেই—এই হচ্ছে সরকারের 'সর্বধর্ম সমভাব'! দেশ-হিতার্থে যে কোন আইনই করা হোক না কেন প্রত্যেকবারই মুসলমানদের 'ধর্ম' প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, আর সাথে সাথে হয় আইন শিথিল করা হয় অথবা তা ঢেলে সাজানো হয়। মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য শরিয়তকে অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে তার জন্য দেশের সংবিধানও বদ্‌লি করা হচ্ছে। এদেশের নাগরিকদের জন্য তৈরী আইন কানুন মুসলমানদের মান্য নয়। তাদের ইসলামের সামনে সব কিছু নগণ্য। এদেশের সংস্কৃতি তারা মানে না। এদেশকে নিজেদের দেশ বলেও মানে না। দেশনিষ্ঠা থেকেই কারো রাষ্ট্রনিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় কারণ রাষ্ট্রের আধার হচ্ছে দেশ। কিন্তু এদেশের মুসলমানরা রাষ্ট্রনিষ্ঠ নয় তাই তারা রাষ্ট্রের আইন কানুন কি করে মানবে! আর যারা রাষ্ট্রনিষ্ঠ নয় তারা দেশদ্রোহী—আর দেশ-দ্রোহীদের এদেশে থাকবার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই—এ হচ্ছে আমার স্পষ্ট মত। 'পরিচয় পত্রে ফটো লাগাবোনা' এই ঔদ্ধত্য কেন? আর সরকার কেন তা মেনে নেয়? দেশের আইন কানুন, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কি মুসলমান এবং ইসলামী ধর্ম, সিদ্ধান্ত নিয়ে একবার তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হোক। নির্বাচন আয়োগ পরিচয় পত্রের যে নিয়ম করেছে তাতে খরচ অত্যাধিক বেশী হলেও অত্যন্ত আবশ্যক। ইসলাম ধর্মে ফটো তোলা নিষিদ্ধ বলে যে মিথ্যা হৈ চৈ করা হচ্ছে তা যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা তার অনেক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। পাসপোর্ট এর জন্য ও ভূপালে যে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাতে মৃত মুসলমান ব্যক্তিদের

আত্মীয়ারা ক্ষতি পূরণ নেওয়ার জন্য বোরখা খুলে ফটো তুলছে—উদাহরণ স্বরূপ এই দুই ঘটনা নির্বাচন আয়ুক্ত শ্রী শেষন সামনে রেখেছেন। তাই 'ইসলাম ধর্মে ফটো তোলা নিষিদ্ধ'—এ এক বাহানা মাত্র। আন্তর্জাতিক আইনে পাসপোর্টে ব্যক্তিগত ফটো অবশ্য প্রয়োজন তাই শরিয়ত আইন আপোষ করে, ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে যেখানে নগদ-নারায়ন প্রাপ্তির যোগ আছে, সেখানেও ঐ আইন আপোষ করতে পারে, কিন্তু (হিন্দুস্থানী) রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কল্যানে যদি কঠোর কথা বলা হয়, তখন ঐ আইন আপোষহীন—অটল, অনড়। এর একটাই কারণ রাষ্ট্রদ্রোহীতার প্রবৃত্তি, ইসলাম ও শরিয়ত আইন ইসলামী রাষ্ট্রে কিভাবে অমান্য করা হয় মুসলমানরাও তা জানে। তবুও হিন্দুস্থানে তাদের এই অন্যায় আবদার তারা চালিয়েই যাচ্ছে আর তাতে তারা সফলও হচ্ছে, কারণ ওরা পাচ্ছে সরকারি সমর্থন। ভোটের লোভে শাসকীয় দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও ওদের জামাই আদর করছে, ওদের মাথায় চড়িয়ে রাখছে।

'মুসলিম ধর্মে বোরখা খোলা নিষেধ'—একথা যে কত মিথ্যা তা তুর্কিস্থানের ও সেখানকার তদানীন্তন সুলতান কামাল পাশার উদাহরণ দিয়েও প্রমাণিত করা যায়। আটশো বছরের প্রাচীন পরম্পরা থেকে তুর্কী মানুষদের মুক্ত করে তাদের এক আধুনিক সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করার প্রাণ পণচেষ্টা কামাল পাশা করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লোবানের সন্ধিতে গ্রীস ও তুর্কস্থানের মধ্যে যুদ্ধের অন্ত হ'ল। ঐ সময়ের যুদ্ধে কামাল পাশার রণনৈপুণ্য ও অসামান্য নেতৃত্বের জন্য তুর্কস্থানে কামাল পাশার কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। কামাল পাশা তুর্কস্থানের প্রগতির দিকে, তুর্কস্থানকে নূতন রূপে সাজাতে, নজর দিলেন। প্রথমেই সুলতানপদ বাতিল করে তুর্কস্থান 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলেও ঘোষণা করলেন ও ইসলামী টুপি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেশের জনতাকে 'হ্যাট' ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালন হচ্ছে না দেখে বল প্রয়োগেও দ্বিধা বোধ করলেন না। তারপর তিনি ক্রান্তিকারী পরিবর্তন করলেন আইন কানুনে। তুর্কস্থানে ইসলামী আইন বাতিল হয়ে 'স্যুইস কোড' চালু হল। কামাল পাশা অনেক ক্রান্তিকারী সিদ্ধান্ত নিলেও আজকের দিনে বেশী করে মনে পড়ছে তাঁর 'মুসলিম মহিলাদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করার কথা। এ হচ্ছে তুর্কস্থানের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ের ঘটনা। কামাল পাশার সংগ্রাম ছিল গ্রীসের বিরুদ্ধে। তিন বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। প্রত্যেক রাত্রে তিনি তাঁর সহকর্মী, ক্রান্তিকারী ও সেনানীদের নিয়ে গুপ্ত পরামর্শ করতেন। অনেক মহিলাও সেই পরামর্শ সভায় উপস্থিত থাকতেন। ইসলামী রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী মহিলারা বোরখা পরেই আসতেন। এই সভায় তুর্কস্থানের আটোমান রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে পরের দিনের রণনীতি কি হবে, তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। কিন্তু এক সময় দেখা গেলো যে সেই গুপ্ত সভায় কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা আটোমান অধিকারীরা আগে থেকেই জেনে নিয়ে সেই ভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে ও কামাল পাশার পরিকল্পনা বানচাল করে দিচ্ছে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকায় পাশা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে

পড়লেন। তিনি, এই ঘটনার সাথে কে বা কারা জড়িত তার খোঁজ নিতে লাগলেন। একদিন পাশা গুপ্ত সভায় এসে বসেছেন, অন্য দিনের মত সবাই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বোরখাধারী মহিলারাও। পাশা আসনগ্রহণ করেই বাইরে অপেক্ষারত নিরাপত্তা রক্ষীদের ডেকে আদেশ দিলেন মহিলাদের বোরখা খুলে ফেলতে। সভায় উপস্থিত অনেকেই অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু পাশার আদেশমত বোরখা খুলে ফেলতেই সবাই আশ্চর্যান্বিত হলেন এই দেখে যে সভায় বোরখার আড়ালে ছিল আটোমান সাম্রাজ্যের পুরুষ গুপ্তচর! এতদিন ধরে বোরখার আড়ালে তারা এই অপকর্ম করে আসছিল। কামাল পাশা তৎক্ষনাৎ আদেশ দিলেন—'আজ থেকে তুর্কস্থানের মহিলাদের বোরখা পরা নিষেধ, কেউ বোরখা পরলে কঠোর দন্ড দেওয়া হবে।' তিনি ঘোষণা করলেন "ধর্মের চেয়ে রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ"। এই ভাবে এক কট্টর ইসলামী রাষ্ট্র তুর্কস্থানে বোরখা পরা নিষিদ্ধ হল। আর আজ আমাদের এই হিন্দুস্থানে—হিন্দুস্থানে কি হচ্ছে?

হিন্দুরা নতি স্বীকার করবে না

কামাল পাশা ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন সেনাধিকারী ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি রাজকীয়, সামাজিক ও ধার্মিক ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারী পরিবর্তন আনলেন। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের অবাস্তব দাবী উপেক্ষা করে ১৯২৪ সালে 'খিলাফত' বরখাস্ত করলেন। ১৯২৫ সালে মুসলিম টুপির বদলে হ্যাট ব্যবহার করার আদেশ দিলেন। ১৯২৬ সালে নতুন নাগরিক আইন কার্য্যকর করলেন যার দ্বারা আইনের দৃষ্টিতে তুর্কস্থানের সব নাগরিক সমান বলে বিবেচিত হল। ১৯২৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন। এক সময়ের ইসলামী রাষ্ট্রে এত পরিবর্তন হল—ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হল। অথচ হিন্দুস্থানের মুসলমানরা ইসলামের দোহাই দিয়ে সব কিছুতে বাগড়া দিচ্ছে। আর আমাদের সরকারও বে-আক্কেলের মত তাদের সব অন্যায় আবদার মেনে নিচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্র তুর্কস্থানে আইন করে মহিলাদের বোরখা সরানো সম্ভব হ'ল অথচ হিন্দুর হিন্দুস্থানে তা সম্ভব হচ্ছেনা। একে কি সহিষ্ণুতা বলা হবে, না নপুংসকতা?

তাই আজ সরকার ও নির্বাচন আয়ুক্তকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিয়ে বলছি—'যদি মুসলমানদের জন্য পরিচয় পত্রে ফটো লাগানোর আইন শিথিল করা হয় তাহলে হিন্দুরাও পরিচয় পত্রে ফটো লাগাবে না। এক দেশে দুই নিয়ম চলবে না—চলতে দেওয়া হবে না। যা হওয়ার হবে—দেখে নেবো। সরকার নতি স্বীকার করলেও হিন্দুরা নত হবে না।

ইসলাম দুর্বলের উপরই বর্ষিত হয় বেশী

তসলিমা নাসরিন

যদি ইসলামকে মানতে হয় তবে সবটুকু মানাই ভাল। সেক্ষেত্রে টেলিভিশনের পর্দায় মেয়েদের ছবি ভেসে ওঠাই তো অত্যন্ত অন্যায়। মেয়েরা পর্দা পুশিদা মত থাকবে, ঘরের বার হবে না, বিজ্ঞাপনে মেয়েদের হাসি ঠাট্টা বন্ধ হবে। নাটকে নারী চরিত্র থাকবে না। ইসলামকে মানতে হলে উচিৎ সবটুকু মানা। আধাআধি মানার তো কোন অর্থ হয় না।

তসলিমা নাসরিন

বোরখা আবার খসে পড়লো

মহারাষ্ট্রে ভোটারদের পরিচয় নির্দেশক পত্র (Identity card) দেওয়ার বিষয় ঘোষণা করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র বোরখা খুলে ফেলে নিজেদের আসল রূপ প্রকাশ করে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারী বাসভবনে ঈদ নিমিত্ত "ইপ্তার" পার্টির আয়োজন করেছিলেন। মুসলমান মহল্লা থেকে পাঠানো বিরিয়ানী গলাধঃকরণ করে পেটে হাত বুলিয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে ঘোষণা করলেন—'পর্দানশীন মুসলিম মহিলাদের পরিচয় পত্রে ফটো লাগাতে যেন না হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।' অর্থাৎ ধর্ম-নিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রী বলতে চাইছেন মুসলিম মহিলাদের চেহারা থেকে ধর্মান্ধতার বোরখা কোন অবস্থাতেই সরানো হবে না—তার জন্য দেশের আইন কানুন গোল্লায় গেলেও আপত্তি নেই! 'মুসলিম মহিলাদের বোরখা সরানো হবে না', এই ঘোষণা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ও তাঁর দলের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র বোরখা যে খসে পড়ল সে খেয়াল তাঁর নেই! ঈদ নিমিত্ত মহারাষ্ট্রের মুসলমানদের, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই উপঢৌকন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল কংগ্রেসের নগ্ন রূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। যদি ফটো সহিত পরিচয় পত্র দিতে হয় তবে তা সবার জন্যই হোক, মুসলমানদের এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হলে হিন্দুরাও ফটো লাগাবে না—একথা এর আগেও আমি স্পষ্ট করে বলেছি আজ আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। আর হিন্দুদের উপর জোর করে চাপানো হলে তার পরিণাম যে গম্ভীর হবে তাও বলে রাখছি। নির্বাচন পদ্ধতি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা এ কি রকম ন্যায়? একরাষ্ট্রে দুই রকম আইন চলবে না। মুসলিম মহিলাদের বোরখা বিষয়ে আমার মত গত বারোই ফেব্রুয়ারীর 'ইসলাম এর চেয়ে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ' এই শিরোনামার সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করেছি। বোরখা না পরা, ফটো তোলা 'ইসলাম বিরোধী' বলে যে প্রচার চলেছে তা অত্যন্ত ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক—তা আমি মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কস্থান ও কামাল পাশার উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। কোন কোন ইসলামী রাষ্ট্রেও যখন বোরখা নিষিদ্ধ তখন এদেশে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে—এক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ভোটের লোভে সব অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া হয় বলেই মুসলমানরা ইসলামী ঢাল এগিয়ে ধরে। মুসলমানদের সামনে নতমস্তক, তাদের জন্য আইন পরিবর্তন করা হবে অথচ সেই আইন হিন্দুদের জন্য বাধ্যতামূলক! কেন এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহার—হিন্দুদের সাথে, তাদেরই দেশে—হিন্দুস্থানে? নতুন আইন তৈরী করার সময়ও ভাবা হয় শুধু মুসলমানদের কথা, ওরা কি মনে করবে? ওদের মতামত কি? ধর্মের নামে মুসলমানদের যথেচ্ছাচার করার স্বাধীনতা দেওয়ার পরিণাম আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত, আসাম, পাঞ্জাব ও সম্পূর্ণ

হিন্দুস্থানে। আগামী কাল বারোই মার্চ ঠিক এক বছর আগে এই দিনেই মুম্বই-এ 'বোমাস্ফোট' ঘটানো হয়েছিল—আর এই জঘন্য পৈশাচিক কুকীর্তি করেছিল এই মুসলমানরাই—ইসলামের বান্দারাই। ইসলামের জন্য তারা এই 'জংগ-এ-বদর' বোমাস্ফোট ঘটিয়েছিল। আর আজ—আজ সেই ইসলামের জন্য এই মুম্বই শহরেই, এই মহারাষ্ট্রেই আইন পরিবর্তন করে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। দেশের মুখ্যমন্ত্রী ঈদ নিমিত্ত মুসলমানদের এই উপঢৌকন দিলেন। এইসব দেখে, বোমাস্ফোটে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাও পরলোকে দুঃখে, বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করছে। তাদের এই অশ্রু, মুসলিম তুষ্টিকরণবাদী সরকারের 'তখ্‌ৎ-এ-তাউস' একদিন ভাসিয়ে দেবেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

'সব মানুষ সমান', এই উপলব্ধি অত্যন্ত মহৎ, আমারও প্রিয়। 'কেউ দরজায় তালা লাগাবেনা' এ সিদ্ধান্তও সুন্দর। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় চোর আছে তাই সেই সুন্দর সিদ্ধান্ত না মেনে সবাই দরজায় তালা লাগায় ; ঠিক সেই রকম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ও রাষ্ট্রের লোকেরা যতদিন পর্যন্ত নিজেদের নিজেদের ধর্মের ও রাষ্ট্রের বিস্তার করবে ততদিন পর্যন্ত আমাদেরও হিন্দু (ধর্ম), হিন্দুস্থান (রাষ্ট্র) এই পরিচয়েই বাঁচতে হবে, দেশেও হিন্দুত্বের তালা লাগাতে হবে।

বীর সাবরকার

'ইদ্গাহ ময়দান' কি পাকিস্তানের?

কর্নাটক রাজ্য হিন্দুস্থানের নকশায় অবশ্যই আছে কিন্তু কর্নাটকের হুবলী শহরের 'ইদ্গাহ ময়দান' মনে হয় হিন্দুস্থানের অধিকারে নেই। গত দুই বৎসর যাবৎ হুবলীর এই ইদ্গাহ ময়দান রয়েছে পাকিস্তানের অধিকারে। গত পরশু দিন অর্থাৎ ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে একথার সত্যতা আরেকবার প্রমাণিত হল, কারণ হুবলীর এই ঐতিহাসিক ময়দানে এবারেও প্রজাতন্ত্র দিবসে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করা গেলোনা। প্রজাতন্ত্র উৎসব পালন করার জন্য শহরের রাষ্ট্রাভিমানী নাগরিকরা ময়দানের দিকে এগোচ্ছিল কিন্তু কর্নাটক পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর লোকেরা তাদের ময়দানে ঢুকতেই দিল না, কারণ কি? না ইদ্গাহ ময়দানে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করলে সেখানকার মুসলমানরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে! হুবলী ও সম্পূর্ণ কর্নাটকের পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। 'হিন্দুস্থানের প্রজাতন্ত্র দিবসে হিন্দুস্থানের এক শহরে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেওয়া হবে না' মুসলমানদের এই দেশদ্রোহী অন্যায় আবদার মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ হুবলী শহরে কার্ফু জারী করা হল। ইদ্গাহ ময়দানের চারিদিকে সশস্ত্র মিলিটারীর পাহারা বসানো হল; আর রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষদের বন্দুকের জোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা থেকে বিরত করা হল! রাষ্ট্র ও জাতীয় পতাকার এই অপমান সহ্য করতে না পেরে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মুরলী পিল্লে ও বাসব রাজ গাডাস এই দুই রাষ্ট্রপ্রেমী তরুণ নিজেদের শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে তিরঙ্গা ঝান্ডা হাতে নিয়ে ও হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ ঘোষণা দিতে দিতে আত্মবলি দিল। এই ঘটনা ঘটল স্বাধীন হিন্দুস্থানে! এর পরে কি প্রশ্ন জাগে না যে হিন্দুস্থান কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছে? আর যদি হয়েই থাকে তাহলে ঐ ইদ্গাহ ময়দান হিন্দুস্থানের না পাকিস্তানের?

গত দুই বৎসর ধরে হুবলীর মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সরকার এই জঘন্য কাজ করছে। হুবলীর এই দেশদ্রোহী মুসলমানদের, সরকার (তাদের ভোটের বিনিময়ে) হুবলী শহর উপঢৌকন দিয়েছে! কাশ্মীরে এই ধরনের ঘটনাতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, এবার হিন্দুস্থানের অন্য অংশেও এই জঘন্য কাজ করার প্রবণতা বাড়ছে। কর্নাটক এক জ্বলন্ত উদাহরণ। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জাফর শরীফ কর্নাটকের। যদি ঐ দিন জাফর শরীফ ময়দানে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করত তাহলে তার বিরুদ্ধে যে সংশয়ের ছায়া জমা হয়েছিল তা দূর হয়ে তাকে এক 'রাষ্ট্রাভিমানী মুসলমান' বলে মানা যেত। কিন্তু কোন মন্ত্রী বা নেতা ইদ্গাহ ময়দানে গেলোনা, জাফর শরীফ সহ সবাই পালালো। আর জাতীয় পতাকা সহ রাষ্ট্রাভিমানী নাগরিকদের কপালে জুটলো পুলিশের

লাঠির প্রসাদ! হিন্দুস্থানের প্রজাতন্ত্র দিনের এ এক ভয়ংকর চিত্র। এই ময়দানে ঈদ এর নমাজও পড়া হয় আর 'জুলুশ' ও হয়, তাতে কিন্তু বাধা দেওয়া হয় না। অতীতের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাও এত নির্লজ্জ ছিল না—যত নির্লজ্জ আজকের এই দেশীয় শাসন ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাষ্ট্রাভিমানী জনতার উপর লাঠি চালিয়ে এরা দেশদ্রোহী কাজের উৎসাহ যোগালো, জাতীয় পতাকার অপমান করল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যে সব শহীদরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের আত্মাও আজ পরলোকে অশ্রু বিসর্জন করছে। হিন্দুস্থান স্বাধীন হয়েছে সত্য কিন্তু হিন্দুস্থানের সামান্য এক অংশ কর্নাটকের ইদ্‌গাহ ময়দান এখনও স্বাধীন হয়নি—সেখানে স্বাধীন হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যায় না। সেই ময়দান রয়েছে মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী মুসলমানদের কব্জায়। এই ঘটনা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষদের জন্য মোটেই সম্মানজনক নয়।

"সামনা"—সতেরোই আগষ্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু

হুবলীর রাষ্ট্রপ্রেমীর রক্তে স্নাত হয়ে উদ্‌যাপিত হল হিন্দুস্থানের আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস! সেই রক্তের ছিটা রাষ্ট্রপতাকায় দাগ রেখে গেলো। কর্ণাটকের ইদ্‌গাহ ময়দানে স্বাধীন হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রপতাকা উত্তোলনে ইচ্ছুক নাগরিকদের উপর জুলুমবাজ কংগ্রেসী সরকার এলোপাথাড়ি গুলি চালালো। কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়লো, লাঠি চালিয়ে অনেকের মাথা ফাটালো। গুলির আঘাতে পাঁচজন শহীদ হল, শতাধিক হল আহত, হিন্দুস্থানের এক অবিভাজ্য অংশ—হুবলী। সেই হুবলী শহরের এক ময়দানে রাষ্ট্রনিষ্ঠ নাগরিকরা নিজেদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারে না, এ কেমন স্বাধীন দেশ? হুবলীতে যা ঘটল সুস্থ মস্তিকের কোন মানুষের পক্ষে তা সমর্থন করা সম্ভব না। অযোধ্যায় মুলায়েম সিং সরকার, নিরস্ত্র রামভক্তদের উপর গুলি চালিয়েছিল, আর কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার নিরস্ত্র রাষ্ট্রভক্তদের উপর গুলি চালালো। প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লার ভাষণে বললেন—"ঝান্ডা উন্‌চা রহে হামারা।" তাকে প্রশ্ন করা উচিৎ কাশ্মীরের সাথে সাথে কর্ণাটকের হুবলী শহরও পাকিস্তানকে উপঢৌকন দিয়েছো কি? পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনার জন্য রাও চেষ্টা চালাবে! হুবলীর ঘটনার পর মানুষ রাস্তায় রাস্তায় কংগ্রেসের নামে থুতু ফেলছে; আর বলছে "কাশ্মীরের যে অংশ অধিকারে আছে তা সামলাতে পারছে না, সেখানে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। সেখানে আদেশ মানা হচ্ছে পাকিস্তানের, আগে তা সামলাও, আগে হিন্দুস্থানের ইদ্‌গাহ ময়দানে তিরঙ্গা উত্তোলন কর তারপর বড়াই কর।" ইদ্‌গাহ ময়দানের ঘটনায় এ দেশের স্বাধীনতা কলঙ্কিত হল। সেখানে তিরঙ্গা উত্তোলন করা হলে এমনকি আকাশ ভেঙে পড়তো? দেশদ্রোহী মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে সরকার তাদের সামনে অসহায় হল আর স্বাধীন হিন্দুস্থানের দেশপ্রেমী নাগরিকদের হত্যা করল। পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যারা শহীদ হন তাদের আত্ম বলিদানে পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। শহীদদের এই বলিদানে দেশদ্রোহী কংগ্রেসী জুলুমের সমাপ্তি পর্বের শুরু হল। ভবিষ্যতে যখন কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে দেশদ্রোহী কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটবে তখন মহাদেব ঘোংগড়ী, মঞ্জুনাথ দরত, শ্রী নিবাস কট্রী, এই সব রাষ্ট্রপ্রেমী শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। তাঁদের আত্মত্যাগের এই অমর কাহিনী এই স্মৃতি স্তম্ভের মাধ্যমে আমাদের অনেক অধস্তন পুরুষদের প্রেরণা যোগাবে ও এই শহীদস্তম্ভ যুগ যুগ ধরে এই শহীদদের কথা মনে করিয়ে দেবে। এরা হবেন চির অমর।

ইদ্‌গাহ ময়দানে তিরঙ্গা উত্তোলন করার পিছনে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ইদ্‌গাহ ময়দান সার্বজনীক স্থান; ন্যায়ালয় এই রায় দিয়েছে। তা সত্বেও

কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার কেবল "মুসলমানদের আপত্তি আছে" বলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে বাধা দিচ্ছে। এই পর্যন্ত ছয়বার রাষ্ট্র পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা সরকার পুলিশ দিয়ে দমন করেছে। আর এইবার সৈনিক ও র‍্যাপিড অ্যাকসন ফোর্স দিয়ে ময়দান ঘিরে রেখেছে। হুবলী শহরে কার্ফ্যু জারী করেছে। এসব করা হল রাষ্ট্রপ্রেমীদের দমন করার জন্য। এসব না করে সরকার যদি যারা বিরোধ করছে সেই দেশদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করত তাহলে তা হত যুক্তিপূর্ণ, আর তাতে জাতীয় পতাকা ও স্বাধীনতা দিবসের সম্মানও বাড়তো। দেশদ্রোহী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে রকম বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেই রকম বন্দোবস্ত অমরনাথ যাত্রী হিন্দুভক্তদের জন্য থাকবে না। তাঁদের ভরসা-ভগবান অমরনাথ। যে ইদ্‌গাহ ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে এত প্রতিবাদ চলছে আসলে এ জায়গার মালিক কে? এই ময়দানে অঞ্জুমান ইসলাম সংগঠন একটা ব্যাপারিকেন্দ্র নির্মাণ করেছিল। এই ময়দান পৌরসভার ; তাই তারা আক্ষেপ করায় বিষয়টি ন্যায়ালয়ের অধীনে দেওয়া হয়েছিলো। ন্যায়ালয় পৌরসভার পক্ষে রায় দেওয়ায় সেই বানিজ্যিক কেন্দ্র ভেঙে ফেলা হয়। তার মানে ইদ্‌গাহ ময়দান সার্বজনীন প্রাঙ্গন বলে নায়ালয় মান্য করল। কিন্তু অঞ্জুমান ইসলাম এই রায়-এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করল। সেই থেকে এই ময়দানের মালিকত্ব নিয়ে বাদ প্রতিবাদ চলছে আর তাতে অপমানিত হল জাতীয় পতাকা—তিরঙ্গা। মালিক যে কেউই হোক না কেন ইদ্‌গাহ ময়দানে স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না এমন রায় কোন ন্যায়ালয় দেয়নি। অঞ্জুমান ইসলাম বলছে ময়দান তাদের। ধরে নিলাম ময়দান তাদেরই ; কিন্তু ময়দান কোথায়? হিন্দুস্থানেই না? স্বাধীনতা দিবসে ময়দানে, সার্বজনীক জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিরোধ যারা করে, তারা দেশদ্রোহী। অঞ্জুমান ইসলামের কর্ম্ম পদ্ধতি শুধু হুবলীতেই নয় দেশের সর্বত্রই আছে। একটা ময়দানের জন্য দেশদ্রোহীদের, কংগ্রেস সরকার সংরক্ষণ দিল—তারপর? অন্যত্র কি হবে? এদের শায়েস্তা করতে হিন্দুস্থানের জনতার কত সময় লাগবে? পাঁচজন আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুকে কিভাবে বরণ করতে হয় তা শিখিয়ে দিয়ে গেছে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পতাকার সম্মানের জন্য মরতে এদেশের দেশপ্রেমীরা ভয় পায় না। এই পাঁচ শহীদের বলিদানে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠলে সেই আগুনে কে কে, কি কি, জ্বলে ছাই হবে কে বলতে পারে?

ইদ্‌গাহ ময়দানে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলে মুসলমানদের কি ক্ষতি হত? যারা নিজেদের এদেশের নাগরিক মনে করে না, দেশের প্রতি যাদের প্রেম নেই তারাই জাতীয় পতাকার বিরোধ করবে। মুসলমানরা তা করেছে, করছে। আর সেই দেশদ্রোহীদের রক্ষার জন্য রয়েছে "সরকারী রক্ষা কবচ্"! দেশদ্রোহী কংগ্রেস সরকারকে দিল্লি ও অন্য সর্বরাজ্যে নিপাত করতে না পারলে ইদ্‌গাহ ময়দানে তিরঙ্গা উত্তোলন করা যাবে না। আজ ইদ্‌গাহ ময়দানে তিরঙ্গা উত্তোলন করা গেলো না।

ভবিষ্যতে দিল্লির লালকেল্লাও ওদের বলে ওরা দাবী করবে। সেখানেও তিরঙ্গা উত্তোলনে বাধা দেবে। সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা থাকবো কি? লাল কিল্লায় বুলেটপ্রুফ কাঁচের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার গুণগান করলেন—কিন্তু সেই স্বাধীনতা দিনে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে হুবলীতে কংগ্রেস সরকারের গুলিতে প্রাণ হারালো দেশপ্রেমী নাগরিক—তার জবাব কে দেবে? পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনতে চলেছে! আগে কাশ্মীরের আতঙ্কবাদীদের সামলাও, তাদের শেষ কর। ইয়াসিন মালিক ধমকানি দিতেই হজরতবালের সৈনিকি পাহারা যে রাও সরকার সরিয়ে নিল সেই সরকারই হুবলীতে ইদ্‌গাহ ময়দানে তিরঙ্গা উত্তোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল। তাদের কাছে দেশদ্রোহী মুসলমানদের কদর বেশী। তাই স্বাধীন হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানেরই এক অংশ ইদ্‌গাহ ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অপরাধ বলে গণ্য হল। জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত হত্যাকান্ড কর্নাটকের কংগ্রেসের জেনারেল ডায়ার বীরপ্পা মোইলী করল। জাতীয় সঙ্গীত যারা গাইছিল তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হল। হুবলীতে পাঁচ শহীদের বলিদানে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুন্দুভি বাজলো এই আশা করব।

হজরতবাল দর্গায় সৈন্য ঢোকানো হোক

কাশ্মীরের হজরতবাল দর্গায় অনুপ্রবেশকারী চরমপন্থীদের কাছে সরকার ও মিলিটারী যেন সামান্যও নতি স্বীকার না করে। যা হবার তা হবে। ধর্মস্থানকে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল করে সরকার ও জনতাকে যারা বেকায়দায় ফেলতে চাইছে সেই দেশদ্রোহী চরমপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা হোক এই হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রেমী নাগরিকদের মত। যে মুসলমান চরমপন্থীরা হজরতবাল দর্গায় বসে সরকার ও সৈন্য বাহিনীকে শর্ত ও দাবী জানাচ্ছে, সরকার যদি তাদের খুশী করতে চায় তাহলে এদেশের দেশপ্রেমী জনতা তা সহ্য করবে না। কাশ্মীরের হজরতবাল দর্গার পবিত্রতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রায় পঞ্চাশজন সন্ত্রাসবাদী সেখানে ঢুকিয়েছে। এই দর্গায় মহম্মদ পয়গম্বরের পবিত্র কেশ রয়েছে, তাই পৃথিবীর মুসলমানদের এ হচ্ছে শ্রদ্ধেয় স্থান। এই বাস্তু ও পয়গম্বরের কেশের কোন রকম হানী হলে হিন্দুস্থানের ধর্মান্ধ মুসলমানরা আবার একবার সম্পূর্ণ দেশে হিংসার তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে তার ফলে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হবে এই হচ্ছে পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি। কিন্তু হিন্দুস্থানের গুপ্তচর বাহিনী ও সৈন্য বাহিনী তা হতে দেয়নি। সন্ত্রাসবাদীরা দর্গায় ঢুকেছে কিন্তু তারা কোনো- রকম দুষ্কর্ম করার আগেই সৈন্যরা দর্গা ঘিরে ফেলেছে। সৈন্য বাহিনীর এই তৎপরতার ফলে দর্গায় আটকে পড়া এই চরমপন্থীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। আর তাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান হাত কামড়াচ্ছে। মানে অস্ত্রোপচার হচ্ছে হিন্দুস্থানে আর তার বেদনা অনুভব করছে পাকিস্তান। কিন্তু এতো আজ নতুন নয়, এ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হজরতবাল দর্গার দিকে বন্দুক দাগাতেই পাকিস্তানের নেতারা বিশেষ করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ হিন্দুস্থানের নিন্দা করল ও পাকিস্তান বন্ধের ডাক দিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় এসেম্বলীতেও এর নিন্দা করা হল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, হিন্দুস্থানের এই আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলা ের, পাকিস্তানের কি অধিকার? হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষার খাতিরে হিন্দুস্থানের সৈন্য যে কোন এক ধর্মস্থলের উপর বন্দুক চালাক, না হয় বোমা ফেলুক তাতে তোমাদের বাপের কি? তোমাদের নিজেদের দেশে এত ধার্মিক ও রাজনৈতিক নোংরা টানাপোড়েন চলছে যে, দেশে শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন হয়েছে আজ পনেরো দিন, অথচ কোন সরকার গঠন হচ্ছে না! বেগম বেনজীর ও নবাব শরীফ একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। কিন্তু হিন্দুস্থান-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বেলায় সব এক। তার কারণ হচ্ছে এই যে ঐ দেশের এবং দেশের নেতাদের অস্তিত্বই টিঁকে আছে হিন্দুস্থান-বিরোধী চক্রের উপর, তা হিন্দুস্থানের শাহাবানু ঘটনা হোক বা বাবরী মসজিদ, না হয় হজরতবাল। পাকিস্তান, হিন্দুস্থান বিরোধী বিষোদ্গার করবেই

করবে। রাষ্ট্রবিরোধী মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা দর্গার আশ্রয়ে লুকিয়ে আছে। এই অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে গুলি চালানো হবে নাতো কি পুষ্প-বৃষ্টি করা হবে?

পাকিস্তানের সক্রিয় উৎসাহে সন্ত্রাসবাদীরা দর্গায় ঢুকেছে। পয়গম্বরের কেশ যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরের তালাও বদল করা হয়েছে। সৈন্যরা সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই সন্ত্রাসবাদীরা হজরত ধর্মশালা অভ্যন্তরে আগুন ধরিয়ে দিল। দর্গার বাস্তুতে ও বিশেষ বিশেষ দেওয়ালে কেরোসীন তেল ঢেলে দিল, সৈন্যরা গুলি চালালে যেন আগুন ধরে যায়। এই আগুনে হিন্দুস্থানে সাম্প্রদায়ীকতার জ্বালাও জ্বলে উঠবে। হিন্দুস্থানে হিংসা ও সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা শুরু হোক এই উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান এই ষড়যন্ত্র করেছে। আবার দর্গায় আগুন লাগলে 'দর্গা জ্বালানো হয়েছে' বলেও সাড়ম্বরে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করা যাবে। পাকিস্তান ও মুসলমানদের যদি পয়গম্বর ও ইসলাম বিষয়ে এতটুকুও প্রেম বা শ্রদ্ধা থাকতো তা হলে তারা ঐ পবিত্র স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের ঢোকাবার মত জঘন্যতা করত না। কিন্তু হিন্দুস্থান বিদ্বেষের ভূত এদের ঘাড়ে এমন ভাবে চেপে বসেছে যে এরা দিশাহীন হয়ে গেছে। কি করছে তাও এদের খেয়াল নেই। তাই দেশের বিভিন্ন মসজিদ, এমনকি এই মহত্বপূর্ণ পবিত্র মসজিদও, অপবিত্র কাজের জন্য ব্যবহার করছে। এ থেকে হিন্দুস্থানের মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি যুদ্ধ করার মত শক্তি পাকিস্তানের নেই ; তা ওরা ভালো করেই জানে। তাই এদেশের মসজিদ ও মুসলমানদের ওরা ব্যবহার করছে। ওদের ঐ জঘন্য চক্রান্তের শিকার হবে, নাকি দেশের প্রতি অনুগত থেকে পাকিস্তানের চক্রান্তকে ধ্বংস করে দেবে—এই সিদ্ধান্ত নেবার শেষ সুযোগ, এই উপলক্ষ্যে আজ মুসলমানদের সামনে এসেছে। হজরতবাল দর্গায় যে সব সন্ত্রাসবাদীরা আটকে পরেছে পাকিস্তান তাদের সমর্থন দিচ্ছে। হিন্দুস্থানের সমস্ত মুসলমানদের উচিৎ পাকিস্তানের এই কাজের প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করা। হজরতবাল দর্গায় আজও সন্ত্রাসবাদীরা আছে। সৈন্যরাও দর্গা ঘিরে রেখেছে। এই ঘেরাও ও সান্ধ্য আইন তুলে নেবার দাবী কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া উচিৎ নয়। কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের সামনে সরকার এতদিন পর্যন্ত নতি স্বীকার করে এসেছে তার কুফল, সমস্ত দেশ ভোগ করেছে বা আজও করছে। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর মন্ত্রী মন্ডলের গৃহমন্ত্রী মুফ্তী মহম্মদ সঈয়দের মেয়েকে অপহরণের নিমিত্ত করে তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে ছেড়ে দেবার দাবী করল আর আমাদের সরকারও তাদের উপর সহৃদয় হয়ে তাদের দাবী মেনে নিল। তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। পাঞ্জাবের সুবর্ণ মন্দিরে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের বের করার জন্য সৈন্যরা যে পন্থা অবলম্বন করেছিল এখানেও সেই একই পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। সুবর্ণ মন্দিরে একজন ভিন্দ্রনওয়ালা ছিল কিন্তু এই দর্গায় যারা লুকিয়ে আছে তারা প্রত্যেকে ভিন্দ্রনওয়ালার থেকেও ভয়ংকর। আলোচনা নিরর্থক। দর্গায় সৈন্য ঢুকিয়ে সন্ত্রাসবাদ কঠোরভাবে দমন করা উচিৎ। পাকিস্তান পয়গম্বরের কেশের অজুহাতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে।

হজরতবাল দর্গা ও পয়গম্বরের কেশের ক্ষতি করার ইচ্ছা কারোর নেই। সৈন্যরাও এখনও পর্যন্ত অশেষ ধৈর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু যে সব সন্ত্রাসবাদীরা ভিতরে ঢুকেছে এরা পাক-সমর্থিত মুসলমান। সেই মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করছে। দর্গা থেকে দুইদিন ধরে সৈন্যদের উপর গুলি চালানো হচ্ছে। মসজিদের সর্বত্র বিস্ফোরক পদার্থ রাখা হয়েছে বলে সন্ত্রাসবাদীরাই খবর পাঠিয়েছে। সৈন্যরা গোলাগুলি চালালে সম্পূর্ণ দর্গাই শেষ হয়ে যাবে মুসলমানই পয়গম্বরের স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট করছে। এদের হয় আত্ম-সমর্থন করতে বাধ্য করা হোক, না হয় গুলি করে হত্যা করা হোক। আজ হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উচিৎ সরকার ও সৈন্যদের সমর্থন জানানো। আর আমাদের সরকারেরও কর্তব্য 'মুসলমানরা কি মনে করবে' এই চিন্তা না করে, ইন্দিরা গান্ধী যেমন দৃঢ়তার সাথে সুবর্ণ মন্দিরে সৈন্য ঢুকিয়ে ছিলেন সেইভাবেই দর্গায় সৈন্য ঢুকিয়ে দেওয়া।

স্যেকুলারিজমের ঔরসে—
মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির গর্ভের
জারজ সন্তান—"কাশ্মীর সমস্যা"।

অনুবাদক

সন্ত্রাসবাদীদের চেয়েও মারাত্মক

হজরতবাল দর্গার প্যাঁচ পয়জার আজ দশম দিনেও কায়েম আছে। গত দুইদিনের ঘটনা ও পরিস্থিতি দেখে মনে প্রশ্ন জাগছে শেষ পর্যন্ত কে নতি স্বীকার করবে, সরকার না দর্গায় আশ্রয় গ্রহণকারী পাক সন্ত্রাসবাদীরা? সন্ত্রাসবাদীদের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের সৈন্যরা বন্ধ করেছে। ওদের বিজলী ও জলের সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে। এইসব দেখে আমাদের সেক্যুলার (?) সরকারের পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সৈন্যদের গোপনে অনুরোধ করছে এ সব না করতে। সন্ত্রাসবাদীদের জন্য খাবারের প্যাকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সাথে ঔষধও। এই খাবার ও ঔষধ গ্রহণ করে ভারত সরকারকে কৃতার্থ করার অনুরোধ সৈন্যদলের অধিকারীরা লাউড স্পীকারের সাহায্যে করছে। কি চলছে এ সব? কাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে? যে বিষাক্ত সাপদের পিষে মারা উচিৎ তা না করে তাদের দুধ কলা দিয়ে পোষার নাম যদি মানবতাবাদ হয় তাহলে এই রকম সর্বনাশা মানবতাবাদ ও ঐ মানবতাবাদের পূজারীদের আগে শেষ করা উচিৎ। এই ভন্ড মানবতাবাদের আমি কট্টর শত্রু। কাশ্মীর-সমস্যা, গত দশ দিনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, হজরতবাল দর্গায় গত ছয়মাস ধরে পাক গুপ্তচর ও সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা জমেছে। এই যে অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে তা নিশ্চয়ই একরাতে ওখানে পৌঁছায়নি। কিন্তু আমাদের সরকার ও সীমা সুরক্ষা দল নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আর এখন ঘুম ভাঙলেও ঘুমের আমেজ কাটেনি। "আলোচনা চলছে"। পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষ বোধ হয় একমম্ অদ্বিতীয়ম্ দেশ যেখানে দেশদ্রোহীদের সাথেও আলোচনা ও আপোষ মীমাংসা করা হয়! দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সৈন্যদলের অধিকারী, কাশ্মীরের রাজ্যপাল সব আলোচনায় ব্যস্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; যে পদে তিনি বিরাজমান সেই পদ এক সময় ভারতের লৌহপুরুষ স্বর্গীয় বল্লভ ভাই প্যাটেল ভূষিত করেছিলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা-কালীন নিজামের বিরুদ্ধে যে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই তৎপরতার একভাগও যদি বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে থাকতো তাহলে দেশদ্রোহীদের খাবারের প্যাকেট পাঠাবার আর তাদের সাথে আলোচনা করার চিন্তাও তিনি করতেন না। এই দেশ বিধ্বংস করার ষড়যন্ত্র যে দর্গায় বসে হচ্ছে সেই দর্গাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রেখে তামাম দেশকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেবার মহাপাপ আজ করছে কংগ্রেস সরকার। সন্ত্রাসবাদীরা উপোষ করে আছে দেখে এদের পেটে ব্যথা হচ্ছে। এদের খাবার হজম হচ্ছেনা—অথচ দেশের পরিস্থিতি যে কি ভয়ংকর সে কথা এদের মনের কোণেও স্থান পাচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা—আমাদের ভাগ্য বিধাতারা। এদের হাতেই রয়েছে দেশ পরিচালনার

চাবিকাঠি। গতকাল খাদ্যের প্যাকেট পাঠিয়েছে আগামী কাল হয়তো পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোন যানবাহনও সরবরাহ করবে। সৈন্যদেরও হয়তো আদেশ দেবে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নতি স্বীকার করতে। এদের মূর্খতা চরমসীমা ছাড়িয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদীরা মসজিদের ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটানোর বন্দোবস্ত করছে—এদৃশ্য সৈন্য-অধিকারীরা দূরবীন দিয়ে দেখেছে। 'জম্মু-কাশ্মীর মুক্তি বাহিনী'র চীফ কমান্ডার, হজত-উল্-মুদাহিদিন ও তার দলবল সহ মসজিদেই আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। আর সরকার, এদেরই জামাই আদরে খাদ্যের প্যাকেট পাঠাচ্ছে! বা...রে মানবতার পূজারীরা. বাঃ ......। ধিক্ তোদের ক্লীবত্বের! 'হজরতবাল দর্গায় ঘেরাও তুলে নাও' বলে যারা মিছিল বের করছে, শ্লোগান দিল, হিংসাচার করল সেইসব পাক-সমর্থক দেশদ্রোহীদের উপর সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল বলে সেই গুলি চালানোর তদন্ত করা হবে বলে রাজ্য সরকার আদেশ দিয়েছে! বাঃ......। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কি বাহার! তাদের উপর কি পুষ্প-বৃষ্টি করা উচিৎ ছিল? দেশদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়াবে সেই অপরাধী! তা সৈন্যবাহিনীর সৈনিকই হোক বা আমাদের শিবসৈনিক। অবশ্য দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য যে সরকার জামাই আদরে খাদ্য সরবরাহ করে সেই কংগ্রেস সরকারের ও কংগ্রেস পক্ষের নেতাদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়? এই সরকার সন্ত্রাসবাদীদের চেয়েও মহাভয়ঙ্কর।

ভারতবর্ষে থাকতে হলে "ভারতীয়" পরিচয়েই থাকতে হবে

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, বৃটিশ এদেশের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে গেলো। ফেলে রেখে গেলো শুধু কিছু সমস্যা। Divide and Rule, এই ছিলো বৃটিশের নীতি। এই নীতি অবলম্বন করেই তারা সারা বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ একশ বৎসর পর্যন্ত নিজেদের অধীনে রাখলো তারপর একদিন "বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না" তাদের এই অহমিকায় ভাঙন ধরা শুরু হল। আর একটা একটা করে দেশ নিজেদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হতে লাগলো, কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে দেশে যে ভয়ঙ্কর, বিযাক্ত এবং জ্বলন্ত পরিস্থিতি রেখে গেলো তার নিদারুণ ফল ভোগ এখনও করতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়ার সময় যে বৃটিশ শাসন আফ্রিকা বিভাজন করলো সেই বৃটিশ শাসনই ভারতবর্ষেরও বিভাজন করেছিলো, আর সেই বিভাজনের দুষপরিণামে আমরা এখনও ভুগছি। পাকিস্তানের সঙ্গে দুইবার যুদ্ধ হল। 'ইসলামী বোমা' ভারতবর্ষের মাথার উপর ঝুলছে, তারজন্য চিন্তা করার বিশেষ কোন কারণ নেই। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এত দৃঢ়, এত মজবুত হয়েছে যে যদি পাকিস্তান আবার ভারত আক্রমণ করে তবে ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে দিতে পারবে। কিন্তু ...

কিন্তু ভারতের ক্ষতি হবার প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে, ঘরশত্রু বিভীষণদের দ্বারা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এমন একটা দিনও গেলোনা যেদিন ভারতবর্ষ আভ্যন্তরিক বিপদ থেকে মুক্ত রয়েছে। কখনও আসামে অশান্তি কখনও আবার পাঞ্জাব স্বতন্ত্র হওয়ার ভয় দেখাচ্ছে। কখনও লালডেঙ্গা বিদ্রোহ করছে আবার কখনও কাশ্মীরে 'ইসলামী ঝান্ডা' উত্তোলন করা হচ্ছে, এই সব ঘটনার পিছে রয়েছে হয় পাকিস্তানের সক্রিয় উৎসাহ না হয় এদেশের মুসলমানদের সক্রিয় প্রেরণা ও সহযোগিতা, দেশ বিভাজনের সময় সাধারণ চিন্তাধারা এই ছিল যে, দেশ বিভাজন যদি করতেই হয় তবে পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুদের হিন্দুস্থানে আনা হোক আর হিন্দুস্থানের সমস্ত মুসলমানদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে তবেই বিভাজন হোক। কিন্তু নেহেরু ও গান্ধী তা মানলেন না। পরিণাম কি হল? তখন হিন্দুস্থানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি, আজ দাঁড়িয়েছে তেরো কোটি। এই ভাবে বাড়তে থাকলে খুব শিগগিরই পৃথিবীর অন্য সব রাষ্ট্র 'সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র' বলে ভারতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে।

কিন্তু মুসলমানদের দোষ দেওয়া অর্থহীন। এ হচ্ছে শাসন কর্তাদের ভ্রান্তনীতির পরিণাম। একদিকে পরিবার পরিকল্পনার নামে "হম্ দো হমারে দো" ঘোষনা করা

হচ্ছে, আর অন্য দিকে মুসলমানদের চার চারটা বিয়ে করার অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার পেছনের যুক্তি অনান্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশে "এক দেশ এক নিয়ম" অর্থাৎ সমান নাগরিক আইন রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আইন এবং বন্ধন এ শুধু হিন্দুদের জন্য আর মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে বিশেষ অধিকার, বিশেষ সুবিধা। এ আমরা আর কত দিন সহ্য করব? ধর্মের দোহাই দিয়ে এ দেশের সংখ্যালঘুরা যত খুশী 'উলঙ্গনৃত্য' করবে আর দেশের প্রশাসকরা না দেখার ভান করবে; এই সব আর কত দিন চলতে দেওয়া হবে? প্রয়োজন বোধে সংখ্যালঘুদের কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কারও আপত্তি নেই কিন্তু যদি তা একদিন দেশের এবং দেশের অন্যান্য জনগণের অ-হিতকারী হিসাবে পরিণত হয় তাহলে কোনও রকম সহানুভূতি না রেখে সেই সুবিধা বাতিল করাই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের দেশে প্রথম থেকেই রাষ্ট্র ও ধর্ম এই দুই বিষয় এক সাথে তালগোল পাকানো হয়েছে। তাই ধর্মের নামে রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ ক্রমে বেড়েই চলেছে। শিখদের, তাদের ধর্মমতে কৃপান ও তলোয়ার সাথে রাখার বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু যখন শিখ চরমপন্থীরা সেই তলোয়ার দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল তখন ধর্মের বিচার না করে তাদের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিতে হল। গুরুদ্বারে অস্ত্রশস্ত্র রাখার নিয়ম ধর্মমতে থাকা সত্ত্বেও যখন সেই অস্ত্র নিজেদের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে লাগলো তখন স্বর্ণ মন্দিরেও সৈন্য পাঠাতে হল। ঠিক সেইভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অন্য কেউ নয়, প্রধানমন্ত্রী নিজে সময় থাকতে মুসলমানদের স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করা উচিৎ এই বলে যে **এদেশে থাকতে হলে এদেশের আইন কানুন মানতেই হবে।** এদেশের শাসন ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে, আর এই দেশের ন্যায়ালয়ের আদেশও শিরোধার্য্য বলে স্বীকার করতে হবে। যারা এসব মানতে অনিচ্ছুক তারা এদেশ ছেড়ে অনায়াসে চলে যাক।

তুষ্টিকরণ অনেক হয়েছে, এ দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রথমে ভারতীয়। তারপর তাদের ধর্ম। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। এই নীতি নতুন নয়। ধর্ম যেমন মুসলমানদের আছে তেমন আমাদেরও আছে, কিন্তু আমরা কোনদিন তা দেশের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটাবার কাজে ব্যবহার করিনি কিংবা সমাজ পরিবর্তনের কাজে বিঘ্ন ঘটাবার কাজেও ব্যবহার করিনি। আমাদের ধর্মে 'মানব হত্যা নিষিদ্ধ' থাকা সত্ত্বেও প্রসঙ্গত, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে সাহায্য করতে হয়েছে। হিন্দু ধর্মে অনেকদিন ধরে 'সতীদাহ প্রথা' প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের চাপে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করার আইন পাশ করলেন তখন গোড়া হিন্দুরা বিদ্রোহ করলেও কঠোরভাবে তা দমন করা হয়েছে। আর আজ? আজ এক মুসলমান মহিলাকে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তার

মৌলিক অধিকার পাইয়ে দিতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় যখন সেই মহিলার পক্ষে রায় দিল তখন সমস্ত মুসলমান সমাজ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। জায়গায় জায়গায় তাদের মিটিং হচ্ছে, উর্দু সংবাদ পত্রগুলি মারাত্মক ভাষায় প্ররোচনামূলক লেখা লিখে মুসলমান তরুণদের উত্তেজিত করছে। 'শরিয়তের বিরুদ্ধে বললে দেখে নেবো' এই রকম ধমকিও দেওয়া হচ্ছে। নমাজ পড়ার সময় মসজিদ থেকেও "শরিয়ত ধোকেমে" এই রকম উত্তেজনামূলক ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের উপমন্ত্রী তারিফ মহম্মদ খান যিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়-কে প্রশংসা করেছেন তার প্রতিকৃতি (Statue) তৈরী করে তাতে জুতোর মালা পড়ানো হচ্ছে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নয়াধীশকে উপলক্ষ করে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শাসন এই সব নির্বিবাদে সহ্য করবে কি? সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়কে পোড়ানোর মত ধৃষ্টতা যদি মুসলমানরা দেখাতে পারে তাহলে কেন্দ্রীয় শাসনের উচিৎ এদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের চাইতেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। "মুসলিম-পার্সোনাল-ল্য" এ হস্তক্ষেপ করলে খুব খারাপ হবে। তেরো কোটি মুসলমান বিদ্রোহ করবে। এই ধরনের প্রকাশ্য ধমকি "নশেমান" এই উর্দূ পত্রিকা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসনের উচিৎ এর উপযুক্ত জবাব দেওয়া। যদিও এদেশে মুসলিম-পার্শোনাল-ল্য নামে একটা আইন আছে, তবুও একথা মানতেই হবে সংবিধানের চেয়ে, অন্য কোন আইন এদেশে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। তাই সেই সংবিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় শাহাবানুর পক্ষে যেমন রায় দিয়েছেন মুসলিমদের তা মানতেই হবে। যেকোন নাগরিক উচ্চ ন্যায়ালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে তাকে ভারতীয় সংবিধানের শত্রু ঘোষণা করে হয় কারাগারে পাঠানো হোক, না হয় দেশদ্রোহী ঘোষণা করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

আমাদের মধ্যেও পণপ্রথা ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে যখন পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন করা হয় কই তখন হিন্দুরা তো আন্দোলন করেনি। বরং ঐ আইনকে স্বাগত জানিয়েছে। তার কারণ হিন্দু সমাজ সুসংস্কৃত। আমাদের সমাজ জাগ্রত, আমাদের চিন্তাধারা দূরদর্শী আর আমাদের ধর্মও সজাগ। তাই ধর্মের সাথে সাথে আমরা রাষ্ট্রের কল্যাণের কথাও চিন্তা করি। এ দেশের মুসলমানরা যদি শুধু নিজেদের ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশের আইন কানুনকে অমান্য বা হেয় মনে করে অবজ্ঞা করে তাহলে যে "মুসলিম পার্শোনাল-ল্য" এর "ঢাল" এরা এগিয়ে ধরে সেই "পার্শোনাল-ল্য" বাতিল করাই বর্তমানে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যতদিন পর্যন্ত "এক দেশ এক আইন" অর্থাৎ সমান নাগরিক কায়দা এদেশে প্রচলিত করা হচ্ছেনা ততদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ স্বাধীনতা চলতেই থাকবে। এতে দেশ পুনরায় খন্ডিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই বিপদ এড়াতে হয় তবে প্রয়োজনবোধে ভারতীয় সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হোক। কিন্তু কোনও অবস্থাতে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনও এক বিশেষ ধর্মের জন্য কোনও এক বিশেষ আইন থাকা উচিৎ নয়। এদেশে হিন্দু,

মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, যে কোন ধর্মের অনুগামী হোক না কেন তারা নিজের নিজের ধর্ম নিজের নিজের ঘরে ও নিজের নিজের উপাসনা স্থানে অনুধাবন করুক কিন্তু এক ভারতীয় হিসাবে ভারতীয় সংবিধানকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। **"যে ভারতীয় নাগরিক, ভারতীয় সংবিধানের কাছে নত মস্তক হবে না, সংবিধানকে সম্মান করবে না, কঠোরতম শাস্তি তার প্রাপ্য"**—যতদিন পর্যন্ত আমাদের শাসন স্পষ্ট ভাবে এ ঘোষণা করবে না ততদিন পর্যন্ত এদেশ এক শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে না। রাষ্ট্র কর্তারা একথা যেন ভালো করে মনে রাখেন।

নয়তো লালকিল্লায় মুসলিম পতাকা উড়বে

গত সপ্তাহে 'শরিয়ত' বাঁচানোর নিমিত্তে শহরের মুসলিমদের মিছিল এবং ে মিছিলের পর সমাবেশে তাদের নেতাদের বিষময় ভাষণ, এসব দেখেশুনে শ য়া সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে, কোণে কোণে যে নেই কয়েকজন করে লোক জমা হচ্ছে সেখানেই সবাই একে অন্যকে প্রশ্ন করছে এই সাম্প্রদায়িক অসুরদের রুখবে কে? কি করে? যে ধর্মান্ধ মুসলমানেরা 'ইসলাম খতরেমে' ঘোষণা দিয়ে এদেশে বার বার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে আবার তারাই আজ এই দেশকে এক কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য সময়ের মতই এখনো মুখে তালা মেরে বসে আছে। আর অন্য রাজনৈতিক নেতারাও পরিস্থিতি এত গম্ভীর হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ভোটের আশায় মুখ বুঁজে আছে। বলছে শুধু মুসলমান! বনাতওয়ালা বলছে, হায়দ্রাবাদের সুলতান সলাউদ্দিন বলছে, বসির প্যাটেল, মৌলানা কাশ্মিরী, সাহীল লোখন্ডওয়ালা এরা বলছে। হাজীমস্তান-ও বলছে, কারণ এ বিষয়ে বলবার অধিকার শুধু মুসলমানদেরই আছে। "ধর্ম" এই শব্দ উচ্চারণ করার একচেটিয়া অধিকারও এদেশে শুধু মুসলমানদেরই দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা প্রত্যেক বাক্যে 'মুসলমান' এই শব্দের জয়ধ্বনি করতে পারবে কিন্তু "হিন্দু" এই শব্দ উচ্চারণ করার অধিকার এদেশে হিন্দুদেরও নেই। আর তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 'হিন্দুস্থান' এ নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। আর তার পর থেকে এদেশে মুসলমানদের তোষামোদ করা হচ্ছে। হামেশা তোষামোদ করা হয়েছে, তাদের জন্য আলাদা 'মুসলিম আইন' পাশ করা হয়েছে, আর সেই আইনের আধারে তাদের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান নির্মাণ করার পরও এদেশের মুসলমানদের জন্য ভিন্ন অধিকার আর তারজন্য আলাদা আইন করার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু ৫ কোটি মুসলমানের ভোটের লিপ্সায় পন্ডিত নেহেরু আত্মমর্য্যাদা বিসর্জন দিলেন আর এদেশের মুসলমানদের এত বিশেষ সুবিধা দিতে লাগলেন, যা তারা পাকিস্তানেও পায়নি। আর এ আইনও শুধু তাদের ঐ বিশেষ সুবিধাটুকু পাইয়ে দেওয়ার জন্যই করা হল। কারণ শরিয়তে উল্লেখিত 'কঠোর দন্ড' যা তাদের ধর্মে তথাকথিতভাবে রয়েছে তা কিন্তু এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হল না। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় জিন্নার পাকিস্তান নির্মাণের সাথে সাথে পন্ডিত নেহেরুও এই দেশে আরও এক অন্তর্নিহিত পাকিস্তান নির্মান করলেন।

এই অন্তর্নিহিত পাকিস্তান আজ তামাম দুনিয়ায় সর্ববৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রে

পরিণত হয়েছে, আর এই দেশে কোন আইন পাশ করা হবে, এদেশের শাসন ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও ঘোষণা করার মতো দুঃসাহসও তাদের মধ্যে গঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যে মুসলমানদের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ কোটি তা বেড়ে আজ হয়েছে ১৩ কোটিরও বেশী। পৃথিবীর ইতিহাসে ও ভূগোলে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর "সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র" এই নামে চিহ্নিত করা হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। আর এই আশঙ্কার ঘন্টাধ্বনি আজই নয় গত প্রায় ২০ বছর ধরে আমি বাজিয়ে চলেছি। কিন্তু কোন প্রতিকার করার চেষ্টা করাতো হলোই না—উপরন্তু আমার পিঠে 'জাত্যাভিমানী' এই লেবেল লাগানো হল। এদেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ভস্মীভূত করার জন্য ঘনিভূত আগ্নেয়গিরির জ্বালা আমি স্পষ্ট অনুভব করছিলাম। আজ যখন তা থেকে অগ্নুৎপাত হল তখন সবার ঘুম ভাঙলো। কিন্তু সচিবালয়ের সামনে যে তিন-সাড়ে তিন লক্ষ মুসলমান জমা হল তা একদিনেই হয়নি। গত দুইমাস ধরে শহরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান বস্তিতে বস্তিতে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো হচ্ছিল, প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে, সমস্ত মসজিদ থেকে 'ইসলাম খতরেমে' উদ্‌ঘোষ দেওয়া হচ্ছিল, উর্দ্দু সংবাদপত্রগুলি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ও ধার্মিক ভাবনা উত্তেজিত করছিল। শাসনকর্তাদের নামে গালাগালি করছিল, ন্যায়ালয়ের বিরুদ্ধে অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করছিল। আর শুধু তাই নয় এই ধরনের মামলা চালাবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মুসলিম লীগ জায়গায় জায়গায় 'শরিয়ত মন্ডল' স্থাপন করছিল। এই রকম সাম্প্রদায়িক, দেশদ্রোহী কার্য-কলাপ যখন মুসলমান মহল্লায় অকপটে চলছিল তখন আমাদের প্রশাসকরা কি করছিল? পুলিশ কি করছিল?

আমাদের শাসনকর্তারা যদি কেবলমাত্র দুই একজনকে আটক করার নাটকীয়তা করে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করে তাহলে তারা যে আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে একথা বলতেই হবে। এমনকি মুসলমানরা একই ইঙ্গিত দিয়েছে বা দিচ্ছে যথা 'যে শাসন মুসলিম ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে তেমন শাসন আমরা এদেশে টিঁকতে দেবোনা'। এই ধমকী আমাদের শাসন সহ্য করবে কি? এদেশে শাসনব্যবস্থা কার হাতে থাকবে তাও যদি মুসলমানরা নির্ধারণ করতে চায় আর তারজন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের গণতন্ত্র উচ্ছেদ করার মত ভাষা ব্যবহার করার সাহস মুসলমানরা দেখাতে পারে তাহলে তাদের ধমকীর তোয়াক্কা না করে মুসলমানদের ভোটদানের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করার কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। **এদেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ। যদি কেউ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করে এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তার বা তাদের ভোটদানের অধিকার রদ করাই শ্রেয়; আমি বলছি বলেই নয় ভারতীয় সংবিধানেই লেখা আছে। তাই মুসলমানরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধর্মের নামে যে প্রতিদ্বন্দীতায়**

আহ্বান করেছে আমাদের শাসনের উচিৎ সেই আহ্বান স্বীকার করে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা।

এ সমস্ত ঘটনা দেখলে এদেশে "সমান নাগরিক আইন" যা এর আগে অনেকবার দাবী উঠেছিল তা যে কত যোগ্য, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মুসলমানদের জন্য আলাদা আইন কেন? একদিকে এদেশ ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা আবার আর এক দিকে বিশিষ্ট এক ধর্মের জন্য আলাদা আইন করা—এই পরস্পর বিরোধী ভূমিকা কেন? পাকিস্তানে বা অন্য কোন মুসলিম দেশে হিন্দুদের জন্য কোন বিশেষ আইন আছে কি? আর এই দেশেও যদি ধর্মভিত্তিক আইন করা হয় তাহলে তা বৌদ্ধদের জন্য কেন নয়? শিখদের জন্য কেন নয়? জৈনদের জন্য কেন নয়? শুধু তাই নয় আমাদের প্রশ্ন তাহলে হিন্দুদের জন্যও কোন বিশেষ আইন নয় কেন? এদেশে সবার উপরে কি? —সবার উপরে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়? সংসদ? নাকি সবার উপরে মুম্বই-এর মুসলমান বস্তি ভেন্ডী বাজারের মুসলমানরা? ঐ মুসলমানরা আজ "শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার" ভয় দেখিয়ে বলছে তাদের 'মুসলিম আইনে' হস্তক্ষেপ করার অধিকার এদেশের কারও নেই। ঐ মুসলমানরা আজ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় মানছেনা —ঐ মুসলমানরা আজ সংসদকেও মানছেনা। তাহলে খালিস্তানবাদীদের দাবী আর এই মুসলমানদের দাবী এর মধ্যে পার্থক্য কি? ধর্মের ঢাল সামনে ধরে খালিস্তানবাদীরা যখন এদেশের অখন্ডতাকে আঘাত করার চেষ্টা করল তখন ধর্মের তোয়াক্কা না করে ভারতীয় সৈন্য স্বর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করানো হোলো। তাহলে সেই সাহস, ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা আজ শাসন উৎখাত করতে চাইছে সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের শাসন দেখাচ্ছেনা কেন? বনাতওয়ালা কে? কে বা কোন শক্তি রয়েছে ওর পিছনে? তাকে লোকসভায় বসতে দেওয়া হয় কেন? আর ঐ সব মুসলমান-লোকসভা-সদস্যদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্য সদস্যরা লোকসভায় শপথ ভঙ্গের অভিযোগ তোলে না কেন? কারণ লোকসভা সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর ঐ সদস্যরা কোরান হাতে নিয়ে ভারতের সংবিধানকে মানবার শপথ নিয়েছে। আর আজ ঐ লোকসভা সদস্য ঐ সংবিধান, সচিবালয়ের সামনে পদদলিত করে "সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় আমরা মানিনা, মানবোনা" বলে অগ্নীদাহ করছে। "ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নং ধারা আমরা গ্রাহ্য করিনা"। এই শ্লোগান দিয়ে মুসলমানদের ধার্মিক ভাবনাকে প্রভাবিত করছে।

শাহাবানুর উপর চাপ সৃষ্টি করে তার বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ায় আজ ধর্মান্ধ মুসলমানরা সফল হয়েছে। ইসলামী আইনের বেড়ী দিয়ে মুসলমান মহিলাদের এরা সব সময়ের জন্য বেঁধে রাখতে চায়, তাই শুধুমাত্র শাহাবানুই নয় লক্ষ লক্ষ মুসলমান মহিলা আজ অর্থাৎ এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৮ বছর পরও বাঁদীর জীবন অতিবাহিত করছে। তা হচ্ছে পুরুষের প্রতি অসহায়, ধর্মের প্রতি অন্ধ নির্ভরতা। এই গোলামী তাদের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্য, ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত

করছে। স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আর তাই ঐ দিন তাদের ঐ মিছিলে ১জন মহিলাও অংশগ্রহণ করেনি। এই ধর্মান্ধ মুসলমানদের এই 'উলঙ্গ নৃত্য' আর কতদিন চলতে দেওয়া হবে? এদেশের গণতন্ত্রের, এদেশের সংবিধানের যে অমর্য্যাদা এরা করে যাচ্ছে তা আর কতদিন সহ্য করতে হবে? উচ্চ ন্যায়ালয়ের দরজাতেই ন্যায়ালয়ের শবযাত্রার মিছিল বের হওয়ার পরও ন্যায়-দেবতা চোখে পট্টি বেঁধে বসে থাকবে কি?

ঐ দিনের মিছিল এই ধরনের নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। শরিয়তের বাহানা করে এদেশের কয়েক কোটি মুসলমানদের ধার্মিক ভাবনাকে প্রভাবিত করার জঘন্য কুটিল ষড়যন্ত্র এদেশে সুসংবদ্ধভাবে তৈরী করা হয়েছে। এদেশে আমরা 'ভারতীয়' পরিচয়ে নয় 'মুসলমান' এই পরিচয় নিয়েই থাকবো এই রকম ইঙ্গিত মুসলমানরা দিয়েছে। আর সেই ইঙ্গিত পুনরুচ্চারণ করছে বনাতওয়ালা লোকসভায়। আর অন্সারীর মত মুসলমান মন্ত্রীও তাকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করছে। বনাতওয়ালা ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করার যে রাষ্ট্র বিনাশকারী প্রস্তাব রেখেছে আমার মনে হয় সে বিষয়ে ভোট গ্রহণ করাই উচিৎ। তাহলে সকলের আসল রূপ প্রকাশ পাবে। এর পরও চুপচাপ থাকা অনুচিৎ। প্রধানমন্ত্রীর উচিৎ স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলা যে, এদেশে থাকতে হলে "ভারতীয়" এই পরিচয়েই থাকতে হবে। যে সতর্কীকরণ ভিন্দ্রনওয়ালাকে করা হয়েছিল কিন্তু সময় পার হয়ে যাবার পর। সেই সতর্কীকরণ বনাতওয়ালাকে সময় থাকতেই করা প্রয়োজন। তা না করে যদি শাসন তাদের বর্তমান এই শিখন্ডী নীতিই চালিয়ে যায়, তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন স্বাধীনতা উৎসবে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য পতাকার দড়িতে টান দেবে কিন্তু যখন পতাকা উড়বে তখন দেখা যাবে যে জাতীয় পতাকা উড়ছে না উড়ছে সবুজ রঙের চাঁদা-তারা মার্কা পতাকা।

"মার্মিক"—তেইশে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

এরা যারাই হোক না কেন

এরা কারা আমার জানা নেই। আমি জাতপাত মানিনা। আমার মতে এদেশে কেবল দুই প্রকার জাত আছে। এক হচ্ছে ভারতীয় আর অন্যটা ভারতদ্রোহী। এ ছাড়া এদেশে আজ অন্য কোন জাত নেই। তাই এরা যারাই হোক তারা নিজেরাই বলুক যে তারা উপরোক্ত দুই জাতের মধ্যে কোন জাতের? যদি এরা ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে চায় তাহলে এদেশের শুধু আইন কানুনই নয় এদেশের রীতিনীতি তাদের মানতে হবে। এদেশের সংস্কৃতি মানতে হবে, এ দেশের ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে শুধু তাই নয় হিন্দু ধর্ম যে এদেশের প্রধান ও বহুল প্রচলিত ধর্ম এও খেয়াল রাখতে হবে। যারা মানতে রাজী নয় তাদের এদেশে থাকবার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। এরা যারাই হোক মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারশী অথবা শিখ, এদেশে থাকতে হলে "ভারতীয়" এই পরিচয়েই থাকতে হবে, না হয় এদেশ ছাড়তে হবে।

এরা যারাই হোক এদের ভারতের ইতিহাস শিখতে হবে, ভূগোল জানতে হবে আর এদেশের ঐতিহ্য, এদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে ভারত হচ্ছে এমন এক মহান দেশ যেখানে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা হয়েছে। তাই এদেশে রামায়ণের সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মহাভারতের। যে রামের মহিমায় "দস্যু রত্নাকর" ঋষি বাল্মিকীতে পরিবর্তিত হলেন সেই রাম ও রামায়ণের অসম্মান যারা করবে তারা যারাই হোক তাদের এদেশে থাকবার কোন অধিকার নেই, একথা তাদের আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট এদেশ স্বাধীন হয়েছে আর তারপর সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র স্থাপন হয়েছে। তার সাথে সাথেই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে এক মহান সংবিধানও তৈরী হয়েছে। এই সংবিধান যারা মানে না তারা যারাই হোক, নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দেওয়ার তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।

সে যে কেউই হোক না কেন, দেশের সংবিধান তাকে মানতেই হবে। ন্যায়ালয়ের সম্মান করতে হবে, ন্যায়ালয়ের রায় মানতেই হবে। যারা মানবেনা তারা যারাই হোক না কেন তারা এদেশের শত্রু। পূর্বপ্রান্ত হোক বা পশ্চিমপ্রান্ত, উত্তরপ্রান্ত হোক বা দক্ষিণ, এদেশের যে কোন প্রান্তেই তারা থাকুকনা কেন এই সম্পূর্ণ ভূমি হচ্ছে প্রভু রামচন্দ্রের জন্মভূমি, এই সত্যকথা যারা এদেশে বসবাস করতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকেই মানতে হবে। প্রভু রামচন্দ্র এদেশের পরম্পরাগত নাগরিকদের আরাধ্য দেবতা। রামায়ণ আমাদের ধর্মগ্রন্থ, এই ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে এদেশের সংস্কৃতি, এদেশের প্রেরণা, এদেশের ঐতিহ্য। যারা এমানিতে রাজি নয় তারা যারাই হোক না

কেন তাদের ভারতীয় বলে মানতে রাজী নই। প্রভু রামচন্দ্রের বসবাসে পবিত্র এই দেশ হাজার বছর ধরে তাকে ভক্তি ভরে পূজা করে আসছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় তাঁকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করে আসছে। সেই মহাপুরুষের এই জন্মভূমি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত হয়েছে। যাদের পছন্দ হয়নি বা সহ্য হয়নি, এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ তাদের তখনই ছিল। যারা সে সুযোগ নেয়নি তারা যারাই হোক না কেন তাদের যদি এদেশে থাকতে হয় তবে 'ভারতীয়' এই পরিচয়েই থাকতে হবে একথা নিশ্চিত।

তারা যারাই হোক না কেন, যে কোন জাতের, যে কোন ধর্মের হোক না কেন এই স্বাধীন ভারতের এক ইঞ্চি জমির উপরও পৃথকভাবে সত্ত্বা পরিচালনা করার তাদের কোন অধিকার নেই। এদেশে নিজের নিজের পবিত্র উপাসনার স্থলে গিয়ে পূজা করতে কেউ কাউকে প্রতিরোধ করতে পারে না। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে গ্রন্থ সাহেবের পূজা করার জন্য শিখদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। দিল্লীর জামা-মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ায় বা নামাজ আদা করায় মুসলমানদের কেউ বাধা দিতে পারে না। গোয়ার সেন্ট-ঝেভিয়ার্স চার্চ-এ গিয়ে প্রার্থনা করতেও খ্রীষ্টানদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আর অযোদ্ধার রাম জন্মভূমির পবিত্র মাটির তিলক শ্রদ্ধার সহিত কপালে লাগাতেও হিন্দুদের কেউ বাধা দিতে পারেনা। যে কেউ তাদের কাউকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে সে যেই হোক না কেন সে এদেশে দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

সে যেই হোক না কেন যে কোন ধর্মের হোক না কেন, যদি ধর্মের নামে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবার চেষ্টা করে তাহলে তার মোকাবিলা করতে হবে। কি ভাবে,এই মুসলমানরা নিজেদের ? আজ অযোদ্ধার রামজন্মভূমি নিজেদের বলে দাবি করছে, কাল কলকাতার কালিঘাটের কালিবাড়িও চেয়ে বসবে, আর দু'দিন পর দক্ষিণের তিরুপতিমন্দিরও দাবি করবে। এদের এই জঘন্য কোলাহল বন্ধ করতে হলে এরা যারাই হোক না কেন এদের আগ্রাসী জাত্যাভিমান ও ধর্মান্ধতা সময় থাকতে ঐ আযোদ্ধার মাটিতেই কবর দিতে হবে। আজ যারা অযোদ্ধায় আগুন লাগাতে চলেছে সেই দেশদ্রোহী মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, যেদেশে রাবনের মত শক্তিশালী রাক্ষসকে তার সমস্ত সেনাবাহিনী সমেত আমরা পরাভূত করেছি, সেখানে তোমাদের মত রাষ্ট্রদ্রোহী ক্ষুদ্র প্রাণীদের কে গ্রাহ্য করে?

এরা যারাই হোক না কেন ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা এদেশের অখণ্ডতা নষ্ট করবার চেষ্টা করছে সেই রাষ্ট্রদ্রোহীদের, সময় থাকতেই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে আবার 'আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে' এই বলে যারা মিথ্যা হৈ চৈ করে, তাদের হাত পা বেঁধে আজ দেশের সীমার বাইরে ছেড়ে আসতে হবে। আজমগড় না হয় আলিগড়, ফৈজাবাদ না হয় মুরাদাবাদ না

হয় এলাহাবাদ—এদেশের যে কোন জায়গায় তারা থাকুক বা থাকতে চাকনা কেন এটা যেন তারা মনে রাখে সে জায়গা তাদের নিজেদের ধার্মীক সাম্রাজ্য নয়। সে জায়গা এদেশেরই অবিভাজ্য অঙ্গ, একথা তাদের স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে। এদেশে হিন্দুদের ধর্মীয় বা সামাজিক বা যে কোন ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ যারা করবে, তারা যারাই হোকনা কেন তাদের এদেশে থাকবার অধিকার নেই। কি, ভাবে এরা নিজেদের? হাতে বন্দুক ও তরোয়াল নিয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণকারী এই দেশদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ বা রোখার সাহস বা জোর যদি শাসনকর্তাদের না থাকে তবে তারা যারাই হোক না কেন সেই রাষ্ট্রদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে হবে—হিন্দুদের—প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র নিয়ে। এদেশের হিন্দুরা আর কত সহ্য করবে? কেরলে হিন্দুরা মার খাচ্ছে, হরিয়ানায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, অমৃতসরেও একই অবস্থা। এখন আবার অযোদ্ধায়ও সেই অবস্থা শুরু হয়েছে। এদেশের এমন প্রশাসকের অভাব যে কঠোর ভাষায় এদের বলবে—'যারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করবে, তারা যারাই হোকনা কেন তাদের ধর্মান্ধতা সমূলে উপড়ে ফেলা হবে।' ধার্মীক ভাবনা উত্তেজিত করে, ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা সমাজে বিষ ছড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে সেই বিধাক্ত নাগদের শাস্তি না দিয়ে যদি পুলিশ বালাসাহেবকানহাইয়ার মত দেশভক্ত সমাজসেবকের উপর অত্যাচার চালায় তাহলে সেই পুলিশ তারা যারাই হোকনা কেন তাদেরও রাষ্ট্রদ্রোহী বলেই গণ্য করা হবে। প্রশাসকদের বন্দুক যদি দেশদ্রোহীদের পরিবর্তে দেশপ্রেমীর বিরুদ্ধেই চালান হয় তাহলে সেই শাসনকর্তা যেই হোকনা কেন তার এক মিনিটের জন্যও শাসনে থাকবার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।

এরা যারাই হোকনা কেন এদের আজ অন্তিম সতর্কীকরণ করে দেওয়া প্রয়োজন। না হয় এদেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে এদেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, বিপদাপন্ন হবে। কারণ এদের ধর্মটর্ম হচ্ছে আসলে এক বাহানা মাত্র! ধর্মের বোরখা পড়ে এরা এদেশের সর্বনাশ করতে চাইছে। এদের জাত, পাত, ধর্ম, কিচ্ছু নেই—এরা 'রাষ্ট্রদ্রোহী'—এই হচ্ছে এদের একমাত্র জাত। এদেশকে টুকরো টুকরো করা—এদেশের সর্বনাশ করা—এই হচ্ছে এদের একমাত্র 'ধর্ম', আর তাই এরা ধর্মের মালিকানা নিজেদের নিজেদের দখলে রেখে নিজেদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। কারো চাই সুবর্ণ মন্দির আবার কারো চাই অযোধ্যার মালিকানা। সময় থাকতে এদের উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে এমন দিন আসবে যখন হিন্দুর অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্দৈব এই যে এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা অধিকন্তু যারা এদের বিরোধ করছে, প্রতিরোধ করছে, এদেশের প্রশাসকবর্গ সেই দেশপ্রেমীদের উপরই অত্যাচার চালাচ্ছে। তাই আজ নিজেদের এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এদেশের সমস্ত হিন্দুদের, ধর্মের পতাকা তলে একত্রিত হওয়ার, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। তাতে যদি 'ধর্মান্ধতা'-র অভিযোগ আসে

আসুক। অমৃতসর ও অযোদ্ধায় যারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার রঙীন স্বপ্ন দেখছে, সেই দেশদ্রোহী মুসলমানদের আজ সাবধান করে দিতে চাই এই বলে যে তোমরা যেই হওনা কেন—এরপরে কাশ্মীর হোক বা পাঞ্জাব, অযোদ্ধা বা জলগাঁও, ভিয়ন্তি না হয় খিদিরপুর যেখানেই হোকনা কেন হিন্দুদের উপর কোনরকম আক্রমণ করার চেষ্টা করলে সমস্ত রাষ্ট্রবাদী হিন্দু একত্রিত হয়ে তার মোকাবিলা করবে। কারণ এদেশের সংবিধান অনুযায়ী এদেশের কোথাও কোন বিশেষ ধর্মের পতাকায় কোন বিশেষ অধিকার নেই, আর তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার কোন বিশেষ অধিকার সংবিধান দেয়নি। তিরঙ্গাই থাকবে এদেশের একমাত্র শাসকীয় ঝাণ্ডা। আর যদি এদেশের নাগরিকরা চায় যে এদেশে ধার্মীক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হোক তবে এদেশের শীর্ষস্থানে উড়বে শুধুমাত্র 'হিন্দু' পতাকা। যাদের এ মান্য নয় সেই ধর্মান্ধ রাষ্ট্রদ্রোহী—তারা যারাই হোকনা কেন—যেই হোকনা—যেখানেই হোকনা কেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যাক। কিন্তু যাওয়ার সময় একটা কথা ভালোভাবে যেন খেয়াল রাখে—পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যাকনা কেন ধর্মের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ কোন দেশ, কোন শাসন কখনো বরদাস্ত করবেনা।

সংকল্প

এবারের শিবাজী ময়দানের সমাবেশ সবদিক দিয়ে অভূতপূর্ব হবে। এই সমাবেশে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো শিবসৈনিক অংশ গ্রহণ করবে। আমার যা কিছু বলার আমি সেই সমাবেশেই বলব, আর তাদের যা আদেশ দেওয়ার তাও ঐ সমাবেশেই দেব। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রই নয়, সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের নজর রয়েছে এই সমাবেশের উপর সে কথা আমার জানা। কারণ এখন থেকে শিবসেনা শুধু মহারাষ্ট্রেই নয় সম্পূর্ণ দেশের ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই আমার দায়িত্বও যে বেড়ে গেছে সে খেয়াল আমার আছে। আজ দেশ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন, প্রতি মুহূর্তে এমন সব ঘটনা ঘটছে যার ফলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেও একবার দেশে এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে দেশ স্বাধীন হতে চলেছে আর ঠিক ঐ সময়েই বাংলা, করাচী ও সিন্ধের মানুষের ভীত, সন্ত্রস্ত ও অমানুষিক জীবন যাপন। একদিকে মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান দাবী আর একদিকে ভারতের অন্য নেতাদের 'কোন অবস্থাতেই দেশ বিভাগ হতে দেওয়া হবে না' বলে সংকল্প। তাদের এই সংকল্প মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, সরদার বলদেব সিং প্রভৃতি নেতারা বার বার প্রকাশ্যে সমর্থন করছিলেন। তবুও পরিস্থিতি ছিল বিভ্রান্তিকর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে এই বিষয়ে সবাই ছিল চিন্তিত। কিন্তু তবুও নেতাদের উপর জনগণের বিশ্বাস ছিল অটল। সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত ছিল যে তাদের উদ্বাস্তু হতে হবে না। তাদের বাড়ি ঘরের লোকসান হবে না। তাই তারা নিজের নিজের জন্মভূমি ছেড়ে স্থানান্তরে যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতাদের দেওয়া আশ্বাসের কোন মূল্যই রইলো না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথেই দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভাজনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ; আর জিন্নার গা ঘেঁসে বসে বিভাজনের চুক্তিতে সই করলেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু গৃহহীন হল। হাজারো হিন্দু প্রাণ হারালো ; আর তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা অত্যাচারের শিকার হল। নোয়াখালি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, সিন্ধে রক্তের নদী বইতে থাকলো। যে গান্ধীজী বিভাজনের পক্ষে অনুমোদন দিয়েছিলেন তিনিই আবার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে অনশন করলেন আর ভারতের কোষাগার থেকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য করলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ উৎসবের সাথে চলতে থাকলো লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের অশ্রু বিসর্জন ও রক্তস্নান। ফলে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য রাষ্ট্র-কর্তাদের বিষয়ে

সর্বসাধারণের মনে এক প্রকার অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হল। আর তার পরিণাম দাঁড়ালো এই, নাথুরাম গোড্‌সে দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর হত্যা ও এক বিতর্কিত যুগের সমাপ্তি।

আজ দেশের পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এক গান্ধীর সমাধির পাশে আর এক গান্ধীর সমাধি বাঁধার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। আবার ঐ দিকে পাঞ্জাবে পুলিশ কমিশনার রিবেরোর উপর পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যেই গুলি চালানো হল। এ অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি। মহারাষ্ট্রে যেমন 'মদ্য তৈরী ও বিক্রি নিষেধক' আইন ও তার জন্য প্রচুর ঢোল পিটানো সত্ত্বেও মোড়ে মোড়ে চোলাই মদ তৈরীর উনানের ধুঁয়া দেখা যাচ্ছে, ঠিক সেইরকম সারা দেশে অহিংসার জপমালা চালু থাকা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের গুলি চালনা চলছেই।

পাঞ্জাবের অনেক শিবসৈনিক আর সাধারণ হিন্দু জনগণও কখনও কখনও এসে আমার সাথে দেখা করে। 'খলিস্থান' এর দাবী কোন অবস্থাতেই মান্য করা হবে না একথা রাজীব গান্ধী ও তার অন্যান্য সাথীরা বার বার ঘোষণা করলেও ১৯৪৭ এর এক গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুস্থানের মানুষ ভুলে যায়নি। তাই এই দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় গান্ধী আবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তার ভরসা কি? এই ধরনের ভাবনা সেখানকার হিন্দুদের মনে উদয় হচ্ছে। কাশ্মীর হোক বা পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানের যে কোন প্রান্তে হিন্দুদের নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি হলে, অসুরক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে শিবসেনা হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন। শিবসেনা কদাপি হিন্দুদের সাথে প্রতারণা করবে না। প্রয়োজনবোধে এবং সময় এলে শুধু মহারাষ্ট্রেই নয় পাঞ্জাবেও শিবসেনা অধিকার গ্রহণ করবে। সেইরকম সিদ্ধান্তই আজ নেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবের অসন্তোষ পুণে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করার পরও যদি শাসন নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে দেশ পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'জিন্দা'র গতিবিধি জানা সত্ত্বেও জিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ইন্দিরা গান্ধীর খুন হয়েছে দু বছর হল এখনও পর্যন্ত খুনীদের সাজা দেওয়া হচ্ছে না। উগ্রপন্থীরা, অসংখ্য নিরপরাধ হিন্দুদের হত্যা করছে কিন্তু একজন উগ্রপন্থীকেও সাজা দেওয়া হচ্ছে না। হিন্দুরা নিজেদের দেশেই আর কতদিন এরকম মার খাবে? উগ্রপন্থীরা মিলিটারী ক্যাম্পে গিয়ে রিবেরোকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করছে। রাজঘাটে পনের দিন পর্যন্ত নিরাপদে লুকিয়ে থেকেছে। এইরকম পরিস্থিতি আর কতদিন সহ্য করা হবে? পাকিস্তান উগ্রপন্থীদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র জোগান দেয়। আবার অস্ত্রশিক্ষাও দেয়, এর জন্য পাকিস্তানে বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর যথেষ্ট প্রমাণ হাতে এসেছে ; যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সামনেও প্রমাণ সহযোগে পেশ করা হয়েছে। পাঞ্জাব মিলিটারীর অধীনে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ বার্নালা সরকার আসলে পাঞ্জাবের সরকার নয় ; এ হচ্ছে পাঞ্জাবের শিখেদের সরকার। তার মন্ত্রীমন্ডলে একজনও হিন্দুমন্ত্রী নেই। পাঞ্জাবে আটচল্লিশ শতাংশ হিন্দু নাগরিক থাকা সত্ত্বেও

মন্ত্রীমন্ডলে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব নেই। সরকারী চাকুরীতে খোলাখুলি ভাবে শুধু শিখদেরই নেওয়া হয়। বার্নালা, মহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিতীয় অবতার। পাঞ্জাব, বার্নালা এবং উগ্রপন্থীদের হাতে সম্পূর্ণরূপে চলে যাওয়ার আগেই ওখানে মিলিটারী শাসন প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

কিন্তু শুধু এতেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। কারণ এর আসল মূল পাঞ্জাবে নয়—রয়েছে পাকিস্তানে। 'পাকিস্তান, উগ্রপন্থীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে'? আমাদের সরকার আর কতদিন পর্যন্ত তা অলস ভাবে গুণতে থাকবে? ভারতের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই। কিন্তু পাকিস্তান, 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির জন্য ভারতীয় কার্য্যের বদলা নিতে চায়। পাকিস্তানকে সেই সুযোগের অবকাশ না দিয়ে, কে কি বলবে এসব চিন্তা না করে ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানে ঢুকিয়ে সেখানকার উগ্রপন্থীদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করা প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রতিকার করলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তান, নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে,—যে কোন মূল্যে।

কিন্তু এসব আমাদের অহিংসাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ (?) সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ চিন্তাধারা প্রণোদিত এক সংগঠন। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এই ছিল বিধির বিধান ; তাই সৃষ্টি হয়েছে শিবসেনার। শিবসেনা, এক পক্ষ নয়—এ হচ্ছে একবৃক্ষ। এ হচ্ছে দেশের সর্বত্র বিস্তৃত এক আদর্শ, এক সংকল্প। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই আদর্শের মশাল আজ আমার হাতে। তাই আমি সংকল্প নিয়েছি—সেই মশাল হাতে নিয়ে হিন্দুদের সংগঠিত করতে। না হলে দেশের মঙ্গল নেই। সংগঠিত হিন্দু। সাম্প্রদায়িকতা-বাদী বা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা-বাদী হবে না। অন্য ধর্মকেও সম্মান করবে। কিন্তু যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে উদ্যোগী হবে—তারা মুসলমান হোক অথবা খ্রীষ্টান কিংবা হিন্দু তাদের এদেশে স্থান নেই, শিবসেনা কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবে না।

মুসলমান বাঁচাও

হ্যাঁ, আজকের সম্পাদকীয়র এই শীর্ষক আমিই দিয়েছি আর এই শীর্ষক কত শোভন তা এই সম্পাদকীয় পড়লেই বোঝা যাবে। আমি সব সময় প্রচার করি হিন্দু বাঁচাও, হিন্দু বাঁচাও। কারও তা পছন্দ হয়, কারও হয় না। কেউ ধর্মের নামে রাজনীতি করছি—এই বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কেউ বলে আমি দেশের শত্রু। কেউ আমাকে ধর্মান্ধ বলে, আবার কেউ আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে ভয় দেখায়। কে কি বলে আর কে কি করছে বা করতে চায় তা আমি গ্রাহ্য করি না—কারণ আমার কথা ও কাজ একই গ্রন্থিতে বাঁধা এবং এসবের উপর আমার নিজের জবরদস্ত বিশ্বাস আছে। তাই আমি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে, হিন্দু বলে প্রচার করতে একটুও লজ্জিত নই। হিন্দুত্বের গুণগান গাইতে, হিন্দুত্বের প্রচার করতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করিনা। যেহেতু আমি হিন্দুত্বের গুণগান গাইছি, প্রচার করছি তার মানে আমি এদেশের মুসলমানদের শত্রু ; এই ধরনের অপ-প্রচার আমার বিরুদ্ধে করা হয়। তাই যদি সত্য বলে মানা হয় তাহলে এও মেনে নিতে হবে যে, এদেশের মুসলমান যারা মুসলিম ধর্মের গুণ গায়, মুসলিম ধর্মের প্রচার করে, যারা মুসলিম বলে গর্ব প্রকাশ করে তারা সবাই হিন্দুদের শত্রু।

কিন্তু অন্তত আজ দেশের পরিস্থিতি এই রকম নয়। শিখরা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে গৌরবান্বিত, মুসলিমরা তাদের ধর্ম সম্বন্ধে গৌরব প্রকাশ করে, সেই রকম আমরা হিন্দুরাও যদি নিজেদের ধর্ম নিয়ে গর্ব প্রকাশ করি তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে, তা থেকে আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। কারণ কোনও ধর্ম নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা মানেই অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, এই সূত্র আমি মানি না। তাই—এই দেশের সমস্ত হিন্দু সুসংগঠিত হওয়া মানেই এই নয় যে, অন্য ধর্মীয়দের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু...

কিন্তু এদেশের হিন্দুদের উপর হিন্দু বলেই যদি আক্রমণ হয় তাহলে এদেশের হিন্দুরা আর তা মুখ বুঁজে সহ্য করবে না। এদেশের হিন্দুদের বাঁচাতে হবে, উদ্দীপ্ত করতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে হবে। কারও বিরুদ্ধে নয়, প্রখর দেশপ্রেম তাদের মধ্যে প্রজ্বলিত করতে হবে। আর তার জন্য হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ব টিঁকিয়ে রাখতে হবে। তাদের আত্মমর্য্যাদা টিঁকিয়ে রাখতে হবে। তাই আমি স্বোচ্চারে বলি—এদেশের হিন্দুদের বাঁচাও, তাদের মধ্যে হিন্দুত্বের অভিমান জাগ্রত কর। আজ যখন দেশের সর্বত্র হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন যদিও আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরা সুসংগঠিত হচ্ছে তবুও এই হিন্দুদের দেশেই হিন্দুদের আত্মরক্ষার মত প্রসঙ্গ আসে

কেন? একথা কেউ চিন্তা করে না। এর আসল কারণ কি তা কেউ ভেবে দেখেনা বা তা প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টাও কেউ করে না। আজ দেশের দুই জাত হিন্দুদের বিরুদ্ধে, এর মধ্যে শিখরা দোদুল্যমান ; মুষ্টিমেয় কতিপয় চরমপন্থী শিখ, আতঙ্কের সৃষ্টি করে সমস্ত শিখ জাতির উপর চাপ সৃষ্টি করে ভয় দেখিয়ে বলছে হয় হিন্দুদের বিরোধ কর না হয় মরবার জন্য প্রস্তুত হও। ধর্মের ঢাল সামনে রেখে এদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে দেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তবুও, এক সম্প্রদায় হিসাবে শিখ সম্প্রদায় আজও রাষ্ট্রপ্রেমী।

একদিকে চলছে কতিপয় আতঙ্কবাদী শিখদের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা আবার অন্যদিকে এই দেশের মুসলমানদের যে মগজ ধোলাই (Brain Washing) চলছে তা ওর চেয়েও ভয়ংকর। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা যে কোন কারণ নিয়ে বিদ্রোহ করছে। আর তা পর্যবসিত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। মহারাষ্ট্রে যে কোন জায়গায় দাঙ্গা হলেই শিবসেনার ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়। হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে তার প্রতিকারার্থে শিবসেনা অবশ্যই প্রস্তুত। কিন্তু দাঙ্গা হাঙ্গামার দোষ যারা শিবসেনার উপর চাপায় তাদের মুখ আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে ; কারণ দাঙ্গা শুধু মহারাষ্ট্রের কোন বিশেষ জায়গায় হচ্ছে না। দিল্লি থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বার বার হচ্ছে। সেই সব দাঙ্গায় শিবসেনার হাত থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেই সব দাঙ্গা মুসলমানরা করছে। এই দেশের মুসলমানরা এইভাবে বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে এই দেশ যখন ধ্বংস করতে চলেছে তখন তা দেখেও প্রতিকার যে শাসকবর্গ করে না, হয় তারা নপুংসক না হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। প্রায় বছর দুই ধরে শুধু মহারাষ্ট্রই নয় দেশের সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে যে এক বিশেষ প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সময় থাকতে দমন না করলে এদেশ যে শুধু আবার খন্ডিত হবে তাই নয় এদেশের ধ্বংস অনিবার্য্য। **'বিভাজন' প্রতিকারের স্থায়ী উপায় না—বিভাজনের এই চল্লিশ বছর পরও অন্তত আমাদের একথা বোঝা উচিৎ। একবার বিভাজন করে যে সমস্যার সমাধান হয়নি আরেক বার করলেও তা হবে না। কারণ "বিভাজন" এই উপায় জন্ম নিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে। পায়ে বিষক্রিয়া হলে পা কাটলেই সেরে যায় না কারণ সেই বিষক্রিয়া হয়তো ইতিমধ্যে সমস্ত শরীরে বিস্তার লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিষ মানুষকে শেষ করেই ছাড়ে। সে বিষের স্বাদ আর কতবার নেওয়া হবে?**

হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা রাষ্ট্রহিত-এর চিন্তা করে সবাই মিলেমিশে একজোট হয়ে থাকুক ; এই আমি কামনা করি। কিন্তু শুধু আমি বা আমরা চাইলেই তো আর তা হবে না। শিখদের মধ্যে যে বিক্ষোভ চলছে তা খোলাখুলি ভাবেই চলছে। কতিপয় চরমপন্থী শিখ ধর্মের দোহাই দিয়ে সশস্ত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু করেছে ও এই দেশের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। তারা চায় দেশ বিভাজন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নানা অজুহাতে যে সব মুসলমানরা হিন্দুদের

বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করছে তাদের কি চাই? দিল্লির চাঁদ্‌নি চকে যে সব মুসলমানরা দাঙ্গা করছে তারা নিজেরাও তা জানে না। কর্ণাটকের "ডেক্কন হেরাল্ড" পত্রিকা অফিসে যে সব মুসলমানরা আগুন লাগালো—কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তাদেরও অজানা। তার মানে এই যে, কোন অদৃশ্য শক্তির সঙ্কেতে মুসলমানরা চিন্তাভাবনা না করে দলবদ্ধ ভাবে কোন কিছুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই অদৃশ্য শক্তি কে? বা কারা? কার প্রেরণায় প্ররোচিত? সেই শক্তির পেছনে কোন্‌ দেশ আছে? সেই শক্তির জোর কেন এবং কার সাহায্য পেয়ে এত শক্তিশালী? সমস্ত মুসলমান সমাজকে এক পলের মধ্যে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করার মত এমন কি মন্ত্র সেই শক্তির অবগত?

এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখবার সময় হয়েছে। অন্তত পক্ষে কর্ণাটকের দাঙ্গা এই দেশকে সেই স্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে। এই দাঙ্গা উপেক্ষা করলে চলবে না। হঠাৎ কেউ সামান্য অসন্তোষ প্রকাশ করল আর দেখতে দেখতে সেই অসন্তোষের আগুন এত লেলিহান হয়ে উঠল কি করে? 'ডেক্কন হেরাল্ডে'র মত সংবাদপত্রের অফিস জ্বালানো হয় আর তার এক কোটি টাকার কাগজ ও অফিস পুড়ে ছাই হয়ে যায় তা সত্বেও এদেশের সংবাদপত্রগুলো তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনা, এও এক শোচনীয় ঘটনা। এদেশে মুসলমানরা যা খুশি করুক সহ্য করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাবে না ও লেখাও যাবে না। মনে হয় এদেশে এই রকম এক অলিখিত নিয়মই তৈরী হয়ে গেছে। ধরা যাক যদি মুম্বই-এর কোন উর্দু সংবাদপত্র হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লিখতো (লিখতো না অনেক সময় লেখেও) আর শিব সৈনিক মোর্চা নিয়ে গিয়ে সেই প্রেস বা অফিসে আগুন লাগাতো তাহলে? তাহলে এদেশের সমস্ত সংবাদপত্রই শুধু নয় পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যে যে ভাবে পারুক সক্রিয় প্রতিবাদ ব্যক্ত করে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়তো। কারণ—কারণ আমরা হিন্দু। এদেশের মুসলমান এতো হিন্দু বিদ্বেষী কেন? মুসলমানদের ব্যবহার, কার্য্য পদ্ধতি কেন এই রকম? এই চিন্তা কখনও কেউ করে কি? 'ডেক্কন হেরাল্ড' কর্ণাটকের ইংরাজী সংবাদপত্র। শতকরা মাত্র দুই জন মুসলমান তা পড়ে। তা সত্ত্বেও সেই সংবাদপত্রের অফিস পোড়াবার জন্য হাজারো মুসলমান একত্রিত হয়। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করার পরও দাঙ্গা চলে। সেই দাঙ্গা কেন করা হচ্ছে, কারা করছে তারাও তা জানছে না, জানে না। তাদের মাথায় কেউ শুধু এই চিন্তা ঢুকিয়েছে যে—'এই দেশ আমাদের ধর্ম নষ্ট করবে'। এই দেশের সমস্ত হিন্দু মুসলমানদের শত্রু, সাধারণ মুসলমানদের মনে এই ধরনের বিষ ঢোকানো হয়েছে। মুসলমানদের নজরে আপত্তিকর যে গল্প 'হেরাল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেই গল্প দশ বছর আগে কেরলে প্রকাশিত হওয়ায় "উৎকৃষ্ট গল্প" বলে পুরস্কৃত করা হয়েছিলো তখন কেরলের কোনও মুসলমান সামান্য পত্র পাঠিয়েও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেনি। তার মানে এই যে, কর্ণাটকে মুসলমানদের এই দাঙ্গা হাঙ্গামা মুসলমানরা নিজেদের ইচ্ছায় করেনি। যে

সব ধর্মান্ধ নেতারা ধর্মের দোহাই নিয়ে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে, তারা করেছে বা করিয়েছে। একরাত্রে সমস্ত মুসলমান সমাজকে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে এও স্পষ্ট হচ্ছে যে, কোন সমস্যা থাক বা না থাক, দাঙ্গা হোক বা না হোক মুসলমান সমাজের মধ্যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক বিষ বপনের চেষ্টা পরিকল্পিত ভাবে অনবরত চলছে। আর সেই কাজের সুবিধার জন্য দুটি ফলপ্রসূ মাধ্যম, সেই কতিপয় ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদের দখলে রেখেছে যা ব্যবহার করে সমস্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে সেই সাম্প্রদায়িক বিষ স্লো পয়জনিংএর মত আস্তে আস্তে ঢোকাবার, এক রাষ্ট্রব্যাপী ষড়যন্ত্র এরা করছে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কোন বিদেশী শক্তির হাত থাকার সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এই রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র ভাঙ্গতে হলে তাদের সেই বিষসঞ্চারক মাধ্যমকেই আঘাত করতে হবে। এই দুই মাধ্যমের এক মাধ্যম হচ্ছে উর্দু সংবাদপত্র। প্রায় সমস্ত উর্দু সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক বিষ ঢোকানোর চেষ্টা সুসম্বদ্ধভাবে চলছে, যথা "সরকার মুসলমানদের সাথে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে"। "মুসলমানদের অস্তিত্ব শেষ করা হবে"। "স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আজ পর্যন্ত বিশ হাজার মুসলমান হত্যা করা হয়েছে"। "সরকারী চাকুরিতে শতকরা দুইজন মুসলমানও নেই"। "ষোল শতাব্দীর মসজিদ, হিন্দুদের হাতে দেওয়া হয়েছে মন্দির বানাবার জন্য", "আরও সাড়ে চারশ মসজিদ মন্দিরে পরিণত করা হবে"। "মুসলমানরা এই বিষয়গুলি বিধিবদ্ধ ভাবে U. N. O.-র কাছে পাঠাবে"। এই ধরনের অপপ্রচার করে উর্দু সংবাদপত্রগুলি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রখর সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে। অন্য কোন সংবাদপত্র যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু লিখলো কিম্বা আমি যদি ধর্মান্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলি বা লিখি শাসন তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখায়। কিন্তু উর্দু সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশে যে সাম্প্রদায়িক বিষের নোংরা প্রবাহ বইছে সে ব্যাপারে সবার মুখে তালা লাগানো।

এদের দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মসজিদ। যে রকম বিষ-সঞ্চারক প্রচার এরা উর্দু সংবাদপত্রের মাধ্যমে করে সেই রকম প্রচার ধর্মের দোহাই দিয়ে মসজিদগুলো থেকেও করা হয়। মুসলমান মহল্লায় অনবরত ধর্মসভা হয়। সেই সভায় সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো হয়। যেহেতু হিন্দুরা কেউ কখনও এই ধরনের সভায় যায় না বা উর্দু সংবাদপত্রও পড়ে না তাই এই রাষ্ট্রদোহী প্রচারকরা এই ধরনের প্রচার নির্বিঘ্নে করতে পারে। এই বিষের জঘন্য পরিনাম মুসলমান সমাজে ক্রমেই বেড়ে চলছে। এর হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষা করবে এমন শক্তি আজ নেই আর থাকলেও শাসনের শিখন্ডী নীতির জন্য তা অস্থিত্বহীন হয়ে আছে। এর হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচানো আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। উর্দু সংবাদপত্রগুলির এই সাম্প্রদায়িক প্রচার কঠোর ভাবে দমন করা উচিৎ, সাথে সাথে এদেশের সত্য পরিস্থিতি কি? তা উর্দুর মাধ্যমে মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব শাসনের। ধর্মস্থান থেকে যে

বিষময় ভাষণ দেওয়া হয় সেই ভাষণের এক টেপ রেকর্ড আমার কাছে আছে। সেই সমস্ত সভায় পুলিশও উপস্থিত থাকে। অথচ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এই বিষয়ে কেউ গুরুত্ব দেয় না। যখন ঔরঙ্গাবাদ কিংবা কর্ণাটক বা অন্য কোথাও গন্ডগোল শুরু হয় তখনই সবার ঘুম ভাঙে। তারপর আবার সব শান্ত। বড়জোর হিন্দুদের, রাষ্ট্রপ্রেমের 'ডোজ' গেলানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। আজ সমস্ত মুসলমান সমাজ ধার্মিক মাধ্যমের এই অপপ্রচারের শিকার হচ্ছে। মুসলমানদের সেই রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচারকারী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শাসনের কর্তব্য সময় থাকতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সেই অপপ্রচার বন্ধ করা। কর্ণাটকের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শাসন যদি মুসলমান সমাজকে সেই সব ধর্মান্ধ দুর্বৃত্ত দেশদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত না করে তাহলে এমন সময় আসবে যখন এদেশের হিন্দুরা চীৎকার করবে—এ মুসলমানদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর। সেই চীৎকার শোনার জন্য হয়তো সে দিন আর কেউ থাকবে না কারণ ততদিনে আমাদের স্বাধীনতা ও অখন্ডতা হয় তো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপেক্ষিক অহিংসা (Relative Non-Violance) গুণ বটে, কিন্তু পূর্ণ অহিংসা (Absolute Non-Violance) পাপ— ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়।

বীর সাবরকার

"মার্মিক"—চৌঠা জানুয়ারী ১৯৮৭

হিন্দুস্থানের সু-রক্ষা?

কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন মুম্বইতে এসেছিলেন তখন মুম্বই কংগ্রেসের সভাপতি মুরলি দেওরা ভিক্ষাপাত্র তার সামনে ধরলে রাজীব গান্ধী সেই পাত্রে একশ কোটি টাকার শুধু আশ্বাসন পত্র দান করলেন, টাকা নয়। সেই একশ কোটি টাকার প্রথম কিস্তিও মনে হয় এখনও ট্যাঁকশাল থেকে ছেপে বেরোয়নি। এরচেয়ে ঐ শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব কংগ্রেসীরা জমা হয়েছিল মুরলি দেওরা যদি তাদের ধুতির কোঁচা ঝাড়তো তা হলেও ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা ঐ ময়দানে ঐ দিন জমা হত। এদিকে সেই একশ কোটি টাকা কিভাবে খরচ করা হবে? বস্তি এলাকা বিকাশের কাজে লাগানো হবে, না নিজেরা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে? এই নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে চলছে তুমুল লড়াই। কাল কে একজন প্রস্তাব রাখলো ঐ টাকা দিয়ে বস্তি বস্তিতে প্রাথমিক এবং আবশ্যিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ চল্লিশ বছরেরও বেশি, আজ পর্যন্ত এ দেশের সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক এবং আবশ্যিক সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় নি, এরজন্য কেউ লজ্জাও প্রকাশ করে না। এই দারিদ্রতা আর কতদিন থাকবে। ১৯৭২ এর পর প্রত্যেক প্রদেশকে প্রদেয় সাহায্যে কাঁচি চালানো হয়েছে। তাই মুম্বইকে জলপথ ও পাতালরেল এর জন্য আরও একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে রাজীব গান্ধীর একশ কোটি টাকা পাওয়া গেলে তাও কম পড়বে। ততদিনে এদেশের দারিদ্ররেখা কোথায় দাঁড়াবে কে জানে? আর বেকার সমস্যাও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের কাজও আজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই দেশকে এই চল্লিশ বছর ধরে দারিদ্রের মুখে কে ঠেলে দিয়েছে? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কেন হচ্ছে? পরিকল্পনা কেন ব্যাহত? কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর সিন্দুক সবসময় খালি? প্রাকৃতিক সম্পদে সর্বাধিক সমৃদ্ধ এই দেশ আজ কেন এত কাঙাল? কেন হিন্দুস্থানকে বিদেশের সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়? অন্যের কাছে হাত পাততে হয় কেন? কেন একশ কোটি টাকার জন্য আজ মুম্বইকে মোসাহেবি করতে হয়? এই পরিস্থিতি কেন? এরজন্য দায়ী কে? কেউ তলিয়ে দেখে কি? প্রশ্ন অনেক হলেও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই—তা হল—পাকিস্তান। ভারতের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী পাকিস্তান। কারণ পাকিস্তান হচ্ছে হিন্দুস্থানের শরীরের গুপ্ত জায়গায় অবস্থিত এক বিষ ফোড়া। একথা বলার সাথে সাথেই আমার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠবে তা আমার জানা আছে। কিন্তু আমি যে অভিযোগ রাখলাম তা আমার ব্যক্তিগত মত না। এ হচ্ছে এদেশের এক অপ্রিয় নিষ্ঠুর সত্য। গত ত্রিশ বছরে দেশের

প্রতিরক্ষার পিছনে অত্যাধিক বেশী খরচ করায় হিন্দুস্থানের আর্থিক পরিস্থিতি আজ অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'প্রতিরক্ষা' এমন এক বিষয় যারা খরচের সম্বন্ধে আলোচনা সংসদ সদস্যরাও এড়িয়ে যান। এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, যে কোন দেশে প্রতিরক্ষা খরচের অপরিহার্য্যতা আর দ্বিতীয় হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের বাস্তব পরিস্থিতির সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। এর মধ্যে দ্বিতীয় কারণটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। প্রতিরক্ষার খরচ সম্বন্ধে লোকসভা ও রাজ্যসভায় যে আলোচনা হয় তা পড়লে যে দুটি বিষয় সাথে সাথেই নজরে পরে তা হচ্ছে প্রতিরক্ষা দপ্তর যে বিবরণ লোকসভায় উপস্থাপিত করে, তা থাকে অসম্পূর্ণ। আর সংসদ সদস্যদের সেই বিষয়ে জ্ঞানও থাকে অপূর্ণ। বিস্তৃত বিবরণ চাইলে দেশের "নিরাপত্তার জন্য গোপনীয়" এই বলে চাপা দেওয়া হয়। গোপনীয়, একথা যদিও সত্যি কিন্তু যা আসল গোপনীয় সে সব লোকসভায় উপস্থাপিত হওয়ার আগেই শত্রুরাষ্ট্রের হাতে পৌঁছায় আর তাতে খরচের অঙ্কটাও বাদ থাকে না। ঐ খরচের পরিমাণটাই হচ্ছে এ দেশের গলার ফাঁস। প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী এদেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রতিবছর খরচ হয় বারো হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশের মোট খরচের আঠারো শতাংশ। অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী। এ হচ্ছে ঘোষিত পরিমাণ, আসল, এর চেয়েও নিশ্চয়ই অনেক বেশী। কারণ প্রতিরক্ষায় এমন অনেক পরিকল্পনা আছে যা লোকসভায়ও উপস্থিত করা যায় না। এছাড়াও রাশিয়া থেকে শুরু করে ফ্রান্স পর্যন্ত ষোলটা দেশ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম আনা হয় তা এই বারো হাজার কোটির মধ্যে ধরা হয়নি কারণ সে টাকা আগামী কুড়ি বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হবে। এই খরচের পরিমান দেখলে একটা প্রশ্ন মনে অবশ্যই উদয় হয়—এক নিরপেক্ষ, অহিংসায় বিশ্বাসী, বিশ্বশান্তিতে শ্রদ্ধালু, আকাশে কবুতর উড়িয়ে শান্তির প্রচারক— হিন্দুস্থানের মত মুনিঋষিদের দেশকে মানবজাতির রক্তে তৃষ্ণা মিটাবার মত এমন ভয়ঙ্কর অস্ত্র শস্ত্রের জন্য প্রতি বছর বারো হাজার কোটির বেশী খরচ করার মত কর্মকাণ্ড কার জন্য এলো? কে এর জন্য দায়ী? আমাদের এই শক্তিশালী, প্রচুর লোকবলের অধকারী দেশ সব সময় কেন এত ভীত সন্ত্রস্ত? প্রশ্ন যেমন সহজ, তার উত্তর, আরও সহজ। পাকিস্তান আমাদের উপর আক্রমণ করবে একমাত্র এই চিন্তা করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সবসময় এত অঢেল খরচ করা হচ্ছে। যেকোন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য দেশকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে একথা সত্য, আর একথাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করতে হবে যে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকাও নিরাপদ নয়, কিন্তু শুধুমাত্র পাকিস্তানের ভয়ে নিজেদের গলায় আর্থিক বন্ধন কত দৃঢ় করা উচিত সে চিন্তাও করতে হবে। ওদিকে আমেরিকা পাকিস্তানকে জলের মত অস্ত্র সরবরাহ করছে আর এদিকে আমরা নিজেদের পরিধানে বস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র কিনছি। এদেশের প্রতিরক্ষা খরচের বিবরণ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করার মত। শত্রুর একটা জলযান বা যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করার জন্য জলের নীচে যে টর্পেডো ব্যবহার করা হয় তার একটার দাম আশি হাজার টাকা। তাই নৌবাহিনীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময়ও

আসল টর্পেডো ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। শুধু মাত্র যুদ্ধজাহাজের পিছনে খরচ হয় তিনশ চৌত্রিশ কোটি টাকা। বিমান বাহিনীর গবেষণার পিছনে আশি কোটি টাকা। সীমান্তে রাস্তা ও অন্যান্য সুবিধার পিছনে একশ কোটি টাকা খরচ করতে হয়। যে সমস্ত বেসরকারী শিল্প, প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করে তাদের দিতে হয় প্রতিবছর দেড়শ কোটি। পদাতিক বাহিনীর খরচ একশ ত্রিশ কোটি। উপকূল রক্ষী বাহিনী দলের পিছনে খরচ হয় একশ পঞ্চাশ কোটি। সীমা সুরক্ষা দলের পিছনে দুশ সাতচল্লিশ কোটি। আসাম রাইফেল বাহিনীর জন্য একশ কোটি। এছাড়াও রয়েছে সুইডেন থেকে যে G. E. F. 400 নামের যুদ্ধ জাহাজ কিছু দিন আগে আনা হয়েছে তার খরচ।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ আপৎকালীন অবস্থা ব্যতিরেকে সাধারণ সময়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে সাধারণত শতকরা দশভাগ। সেই তুলনায় হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষ্য করার মত। ১৯৭৬-৭৭ সালে প্রতিরক্ষা খরচ ছিল পঁচিশ শ' কোটি। আর আজ তা দাঁড়িয়েছে বারো হাজার কোটি। খরচের পরিমাণ এইভাবে বাড়তে থাকলে যুদ্ধ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ হয় মরুভূমিতে পরিণত হবে, না হয় কোনও বৃহৎ দেশের কাছে এই দেশকে বন্ধক রাখতে হবে। (যা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হল—অনুবাদক) কারণ এই খরচের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। প্রত্যেক সৈন্যের পিছনে প্রতিবছরের খরচ পঁয়তাল্লিশ হাজার। একটা যুদ্ধ বিমানের জন্য দিতে হয় পাঁচ কোটি। সাধারণ জাগুয়ার বিমানের দাম সাড়ে তিন কোটি। আজ হিন্দুস্থানের সৈন্যসংখ্যা বারো লাখ। পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান। H. A. L., B. H. E. L., Mazgaon Dock, গার্ডেনরিচ ওয়ার্কসপ্, গোয়া শিপ ইয়ার্ড, ভারত আর্থ মুভস্, ভারত ডায়নামিক, প্রাগাটুল্‌স্ এই সব বড় বড় কলকারখানা ছাড়াও আরও আঠাশটা কারখানা যুদ্ধসামগ্রী তৈরীর কাজে লিপ্ত। প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক কর্মচারী তাতে কাজ করছে। এছাড়াও যুদ্ধের উপযুক্ত যানবাহন তৈরী করিয়ে নিতে হয় Telco থেকে। অর্থবিজ্ঞানীদের আন্দাজ ১৯৯০ পর্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা খরচ গিয়ে দাঁড়াবে বিশ হাজার কোটি।

এসব কেন করা হচ্ছে? আমেরিকা পাকিস্তানে যুদ্ধশিবির বানিয়েছে সেই জোরে পাকিস্তান সবসময় হিন্দুস্থানকে হুমকি দিচ্ছে। অন্যান্য হিন্দুস্থান বিরোধী দেশগুলিও এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে উৎসাহ দিচ্ছে। মুম্বই শহরের উপর আক্রমণ করার জন্য দুশো চল্লিশ মাইল দ্রুতগামী এফ-১৬ জাতীয় যুদ্ধ বিমান আজ পাকিস্তানের আছে। তাছাড়া কাহুটাতে রয়েছে পরমাণু অস্ত্র তৈরীর কারখানা। পাকিস্তানের কাছে পনের ডিভিশন পদাতিক সৈন্য থাকায় হিন্দুস্থানকে একমাত্র পাকিস্তান সীমান্তে একুশ ডিভিশন পদাতিক সৈন্য রাখতে হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তান প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বাড়িয়েছে তাই হিন্দুস্থানকেও প্রতিরক্ষার পিছনে খরচ বাড়াতে হচ্ছে। আমেরিকা ও পাকিস্তানকেও প্রতিরক্ষার পিছনে খরচ বাড়াতে হচ্ছে। আমেরিকা ও পাকিস্তান হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ সামরিক চাপ সৃষ্টি করছে। হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আজ এত সুদৃঢ় যে পাকিস্তান আক্রমণ করলে তার অস্তিত্ব শেষ করে দিতে সময় লাগবে না। কিন্তু পাকিস্তান চাতুরীপূর্ণ ব্যবহার

করছে,আক্রমণ করার মত সাহস তাদের নেই, ইচ্ছাও না। পাকিস্তান শুধু চায় হিন্দুস্থানকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থা ঢিলা করতে। আর পাকিস্তান তাতে সফলকাম হয়েছে, একথা দুঃখের সাথে স্বীকার করতেই হচ্ছে। হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা খরচ যেন দিন দিন বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান কখনও এ্যাটম বোম বানাবার কথা বলে, আবার কখনও সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি করে গণ্ডগোল পাকায়, কখনও অন্য রাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনে আবার কখনও সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠায়। হিন্দুস্থানের আকার পাকিস্তানের দশগুণ। তাই পাকিস্তান একজন সৈন্য ভর্তি করলে আমাদের করতে হয় দশজন। একটা যুদ্ধ জাহাজ কিনলে আমাদের কিনতে হয় দশটা। ওরা একটা মিরাঝ বিমান নিলে আমাদের নিতে হয় দশটা। কেবল কৌশল করে হিন্দস্থানকে আতঙ্কে রেখে হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থা খারাপ করা ; এই কাজ পাকিস্তানের পক্ষে সহজ হচ্ছে কিন্তু হিন্দুস্থানের পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর।

পরিস্থিতি এই রকমই চলতে থাকলে একসময় মহাসঙ্কট দেখা দেবে। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য খরচ করতেই হবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের মত এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের হুম্‌কির ভয়ে যদি অবাস্তব খরচ করতে হয় তাহলে হুম্‌কি যাতে একেবারে বন্ধ হয় সেই উপায় করাই দেশের পক্ষে শ্রেয়। প্রতি বছর বারো হাজার কোটি খরচ করার চেয়ে একবার পঞ্চাশ হাজার কোটি খরচ করতে হলেও আপত্তি করার কিছু নেই। পাকিস্তানের এই জঘন্যতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনে হিন্দুস্থান তৃতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করুক। কিন্তু সেই যুদ্ধ যেন হয় শেষ যুদ্ধ ও নির্ণায়ক। পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে ফেলা পর্যন্ত। বর্তমান খরচ বহুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে সেই যুদ্ধ হবে হিন্দুস্থানের পক্ষে অনেক লাভদায়ক।

শহাবুদ্দীনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক

সংসদ সদস্য সৈয়দ শহাবুদ্দীন তার সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত ফনা আবার তুলেছে, বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে দেশের তেরো কোটি মুসলমানকে প্রজাতন্ত্র দিনের উৎসব বর্জন করতে বলছে, রাশিয়া ও চীনের মত সাম্যবাদী দেশে যদি কেউ এই ধরনের দেশদ্রোহী কাজে প্ররোচিত করত তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে মারা হ'ত। যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এই ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহের সাজা—প্রাণদণ্ড, রাষ্ট্রদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আইন ভারতীয় সংবিধানেও রয়েছে, ভারতীয় সংবিধানে সবার জন্য এক আইন নয়। হিন্দুদের জন্য এক আইন ও মুসলমানদের ভিন্ন। তাই মুসলমানদের জন্য যে আইন সে আইনে কোন মুসলমান দেশদ্রোহ করলে তাদের কোন বিশেষ ছাড় আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে। প্রজাতন্ত্র দিনের উৎসব বর্জনের ঘোষণাকারী শহাবুদ্দীন জনতা পার্টি মনোনীত সংসদ সদস্য। জনতা পার্টির বোরখা খুলে দিয়ে তাদের 'সর্বধর্ম সমভাব' এই প্রচারের আসল রূপ শহাবুদ্দীন জনতাকে দেখিয়ে দিয়েছে। আর আসলে জনতা পার্টি হচ্ছে এ দেশের কিছু ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামীর আসর। তাতে সামিল হয়ে শহাবুদ্দীন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ায়। কয়েকমাস আগে প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞেস করেছে তেরো কোটি মুসলমান বিদ্রোহ করে রাস্তায় নামলে প্রধানমন্ত্রী কি করতে পারে? আর এখন তো মুসলমানদের উস্কানী দিচ্ছে দেশবিদ্রোহী হতে ; মুসলমানদের ধর্মান্ধতা বজায় রেখে তাদের সাম্প্রদায়িকী ভাবনা উত্তেজিত করার জনতা পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ আড্ডায় পরিণত হয়েছে। যেই নিহাল আহমদ গণেশ পূজার গণেশের মূর্ত্তির সামনের সাজসজ্জা লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষের বীজ বুনলো জনতা পার্টি জনগণের অনুভূতির চিন্তা না করে সেই নিহাল আহমদকেই আজ সম্মানিত করছে। শহাবুদ্দীনের মুখোশ খোলার আগে আজ প্রথম জনতা পার্টির শ্রাদ্ধ করতে হচ্ছে। জনতা পার্টির নেতারা মাঝে মাঝেই পাকিস্তানের গুণগান করে। 'পাকিস্তান ভারতের অমঙ্গলকারী নয়, এই দেশের সরকার নিজেদের প্রশাসকীয় ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য সময় সময় পাকিস্তানের জুজুবুড়ি সামনে রাখে,' এ ধরনের প্রচারও এ পার্টির নেতারা করে বেড়ায়। এ পার্টির নেতারা মাঝে মাঝেই বিনা কারণে পাকিস্তান সফরে যায়, সেই দেশের প্রেসিডেন্টের আতিথ্য গ্রহণ করে কৃতার্থ বোধ করে, আর দেশে ফিরে এসে নুন খেয়ে গুণ গাওয়ার মত পাকিস্তানের গুণগান করে। হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী, প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনকারী, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানদের ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে এই পার্টি। এই পার্টির মুসলমান প্রেম ও পাকিস্তান প্রেম মাঝে মাঝে এত চাড়া দিয়ে ওঠে মনে হয় এই পার্টি হচ্ছে এই দেশে বসে পাকিস্তানের ভাট্‌গিরি করার দূতাবাস। নিহাল

আহমদ এই জনতা পার্টিরই বিধায়ক, এই নিহাল আহমদ সার্বজনীন গণেশ পূজার সামনের সাজসজ্জা লাথি মেরে ভেঙে ফেলায় এই রাজ্যের হিন্দুদের মধ্যে যখন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তখন এই জনতা পার্টির নেতারা ভয়ে আহমদ সহ শিয়ালের মত গর্তে লুকিয়ে ছিল। নিহাল আহমদের এ ধর্মান্ধ কাজের না কোন নিন্দা করল, না দুঃখ প্রকাশ। আজ এই পক্ষেরই এক সংসদ সদস্য 'প্রজাতন্ত্র দিন' উৎসব বর্জনের জন্য যখন প্রকাশ্যে মুসলমানদের উত্তেজিত করছে এ পার্টির নেতারা তার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা কি তা তারা এখনও প্রকাশ করছে না, বা শহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণও করছে না। তবে তাদের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আসলে প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনের প্রস্তাব শহাবুদ্দীন একুশে ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদ অধিবেশনেই রেখেছিল। ঐ অধিবেশনে জনতা পার্টির অন্য এক সংসদ সদস্য ইব্রাহিম সুলেমান শেইঠ্ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত উপস্থিত ছিল। তার মানে এই রাষ্ট্রদ্রোহী প্রস্তাব জনতা পার্টি আগেই জানতে পেরেছিল! কিন্তু তারা মুখ বুঁজে ছিল। প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত উর্দু সংবাদপত্রগুলি এই ঘোষণা লক্ষ্মনীয় ভাবে ছাপিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়ালো। তখনও জনতা পার্টির অন্যান্য নেতারা মড়ার মত নিঃশব্দ ছিল। জনতা পার্টির অন্য নেতা যারা যখন তখন ইস্তেহার প্রকাশ করে বেড়ায় তাদের কলম এখন কোনও বিশেষ জায়গায় ঢোকানো রয়েছে কি? ডিসেম্বরের শেষের দিকে দিল্লির এক ইংরাজী পত্রিকায় এই সন্তাপজনক সংবাদ প্রকাশিত হলে জানুয়ারীর দুই তারিখে চন্দ্রশেখর দাড়ি চুলকিয়ে এক ভণ্ডামিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। তার আগে পর্যন্ত জনতা পার্টির এই ভণ্ড সভাপতি ঘুমিয়ে ছিল কি?

এই ইস্তেহারও চন্দ্রশেখরের জঘন্য ভণ্ডামীর পরিচায়ক। এতে কাউকে ধিক্কার জানানো হয় নি। শুধু বাবরি মসজিদ সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, এ ধরনের কিছু না করতে। তার মানে ভবিষ্যতে পাকিস্তান আক্রমণ করলেও চন্দ্রশেখর ভর্ৎসনা জানাবেনা বরং জিয়াকে অনুরোধ করবে "বাবারে আমাদের মাথার উপর বোমা ফেলিস না।" এই ইস্তেহারে শহাবুদ্দীনের উল্লেখও নেই! এইভাবে দেশদ্রোহীদের সমর্থন করাও যে দেশদ্রোহ এ কথা চন্দ্রশেখরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এর চেয়ে ভালো হয় যদি চন্দ্রশেখর জনতা পার্টির জরুরী সভা ডেকে তাতে তার সহকর্মীদের নিষ্ঠা ভারতের উপর আছে না পাকিস্থানের উপর এই বিষয়ে ভোট গ্রহণ করে তাহলে তখনই তার পার্টির আসল রূপ জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট হবে। আমি আজ আরও একধাপ এগিয়ে বলতে চাই স্ব-পক্ষীয় দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যে পক্ষ করতে পারে না বা করে না সেই পক্ষের সাংবিধানিক অনুমোদন ও সাথে সাথে সেই পক্ষের সব গণ প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব রদ্ করা হোক

কিন্তু সরকারও তা করবেনা আর জনতা পার্টিও শুধরাবেনা, কারণ উভয়েই এক জাতি ও নপুংসক। আজ একমাত্র মধু দণ্ডবতে এর বিরোধ করছে। কিন্তু মধু দণ্ডবতে মানেই সম্পূর্ণ জনতা পার্টি নয়। কিন্তু কেউ কিছু করুক বা না করুক শহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাই শহাবুদ্দীনকে তার প্রাপ্য সাজা দিতে জনগণকেই সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রাভিমান যাদের আছে এ ব্যাপারে তাদের আওয়াজ তুলতে হবে। একবার প্রজাতন্ত্র দিবসে সমারোহ না হলেও আপত্তি নেই কিন্তু "ঐ প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা সাক্ষী রেখেই প্রকাশ্য রাস্তায় শহাবুদ্দীনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে," এই স্পষ্ট ভূমিকা নিয়েই জনগণকে সংগঠিত হতে হবে। শহাবুদ্দীনের মত দেশদ্রোহীদের এদেশে বা কোন দেশেই স্থান হয় না। আমি এ দাবী করছিনা যে শহাবুদ্দীন নামক এই বিষাক্ত জীবকে পাকিস্তানে পাঠানো হোক। কারণ ওকে পাকিস্তানে পাঠানো আর বন্দী খলিস্থানবাদী জিন্দাকে কানাডায় পাঠানো সমান। কারণ এই শহাবুদ্দীন মানুষ নয়, এক বিষাক্ত সাপ। এই বিষাক্ত সাপ সব সময় দেশের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ফনা তোলে। এই নাগের বিষদাঁত উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। এমন ঔদ্ধত্য যে এত বিরোধ হওয়া সত্বেও একবারও ত্রুটি বা অপরাধ স্বীকার করছে না। বাবরি মসজিদ পরিষদে বর্জনের প্রস্তাব দিয়েই চুপচাপ বসে নেই। দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছে। মুসলমান নেতা ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে সাক্ষাৎ করে এই প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জন, কার্য্যকর করার সাহায্য চাইছে। সময় থাকতে ওর এই বিষময় প্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে এই দেশে আর এক ভিন্দ্রন-ওয়ালা সৃষ্টি হবে। সেমিনার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী রোমেশ থাপর তো তাকে তাড়িয়েই দিয়েছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে দেশের সব মুসলিম সংগঠন শহাবুদ্দীনের নিন্দা করছে, তবে তা শহাবুদ্দীনের অভিপ্রায় বা মতলবের নিন্দা, নাকি তা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করায় নিন্দা তা এখনও স্পষ্ট নয়—কারণ মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি, তাদের মতামত কি তা তাদের বলতে বাধ্য করতে হবে—কারণ কেরলে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী মুসলিম লীগের, এই অবস্থায় লীগের মৌনতা কেরলকে পাঞ্জাবের পথে ঠেলে দেবে—যা হবে দেশের পক্ষে হানিকারক। না হয় জনতা পার্টির সাথে সাথে মুসলিম-লীগকেও পোঁটলা পুঁটলী বেঁধে সমুদ্রে ডোবাতে হবে। কিন্তু আজ মুসলিম লীগের মৌনতার চেয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের মৌনতা বেশী হানিকারক। সমস্ত দেশ যখন রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই সাম্প্রদায়িক আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে তখন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী কোথায় স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে? রোম যখন জ্বলছিল সেই সময় যে নীরো বেহালা বাজনায় মগ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর এই লজ্জাকর মৌনতা দেখে হয়তো তার আত্মাও পরলোকে লজ্জায় মাথা নীচু করছে। ছয়মাস আগে শহাবুদ্দীন যখন তেরো কোটি মুসলমান রাস্তায় নামবে বলে হুমকি দিয়েছিল তখনই তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই মানুষই আজ এত লাগাম ছাড়া হয়েছে যে প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জন করার মত কথা বলতে সাহস করছে। ভারতীয় সংবিধানের ত্রিশ ও তিনশ সত্তর ধারায় সংখ্যালঘুদের কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে। কিন্তু শহাবুদ্দীনের মত রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানরা যদি একথা মনে করে থাকে যে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহ করার অধিকারও দেওয়া

হয়েছে তাহলে সেই মুসলমানদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সংবিধানে রয়েছে—দেশদ্রোহীদের সাজা—প্রাণদন্ড। এদেশের দুর্ভাগ্য যে শহাবুদ্দীনের মত মানুষ সংসদের সদস্য হয়েছে। কিন্তু কোরান স্পর্শ করে দেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েই সে সংসদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। লোকসভার সভাপতির উচিৎ নিজের আইনগত ক্ষমতায় শপথভঙ্গের অভিযোগে তার সদস্যপদ রদ্ করা। কিন্তু শুধু এটাই পর্যাপ্ত নয়—এই বিষবৃক্ষ উপড়েই ফেলতে হবে। জনতা-পার্টি রাষ্ট্রদ্রোহী শহাবুদ্দীনের নিন্দা বা বিরোধ করছেনা। মুসলিম লীগের মুখেও তালা লাগানো। এতেই বোঝা যায় এদেশের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কিরকম বিষ সঞ্চারিত হচ্ছে। তা রুখতে হলে উচিৎ শহাবুদ্দীনের মত মানুষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দাখিল করে তাদের প্রাণদন্ডের আদেশ দেওয়া, তাহলে ঐ রাষ্ট্রদ্রোহী শয়তানরা বুঝবে রাষ্ট্র পতাকার দড়িতে টান দিলে আকাশে উড্ডীয়মান রাষ্ট্রপতাকাকে রাষ্ট্রের যে নাগরিক সম্মান জানায় না দড়ির ফাঁসই ঐ রাষ্ট্রদ্রোহীর একমাত্র প্রাপ্য সাজা, কারণ যেকোন দেশেই দেশদ্রোহীর একমাত্র সাজা—প্রাণদন্ড।

"মার্মিক"—বারোই জুলাই ১৯৮৭

মীরাটের ভূতের খেলা

খলিস্থানী আন্দোলনের পিছনে পাকিস্তানের হাত আছে একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমাদের দেশের শাসন এবিষয়ে পাকিস্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে, বদলা নিতে অক্ষম একথাও আজ ততটাই স্পষ্ট। খলিস্থানবাদীদের পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পাকিস্তান তাদের অস্ত্রশস্ত্রও দেয়। তাদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে রয়েছে পাকিস্তানী চিহ্ন। পাকিস্তান বর্তমানে আমেরিকার থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পায়। তাই বর্তমানে পাকিস্তানের কাছে রয়েছে অঢেল অস্ত্রশস্ত্র। খলিস্থানবাদীরা কত অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অস্ত্রশস্ত্র খলিস্থানীদের কাছে বেশী না পুলিশ কমিশনার রিবেরোর কাছে? কারণ যেদিন রিবেরো ঘোষণা করে খলিস্থানীদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে পরের দিনই দেখা যায় তারা দু-চারজনকে হত্যা করেছে। পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতিশাসন চালু করেও আতঙ্কবাদীদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়নি।

একদিকে যখন এই উপদ্রব চলছে অন্যদিকে তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গুজরাট, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা নিয়মিত মাসিক কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহারাষ্ট্রে ও বিশেষ বিশেষ জায়গায় এই সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত সাপেরা মাথা চাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলছে অমুক সহ্য করা হবে না, তমুক সহ্য করা হবে না। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই দাঙ্গা কেন তা জানা যাচ্ছে না। কারণ এর পিছনে কোন কারণই নেই। বিনা কারণে দাঙ্গা হলে তার গুরুত্ব অধিক, কারণ তার পিছনে থাকে কারো না কারো উষ্কানি। দিল্লী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে আমাদের দেশের এই দাঙ্গার পিছনে কেবলমাত্র পাকিস্তানই নয়, রয়েছে আমেরিকাও। পাকিস্তান ও আমেরিকা কোন অবস্থাতেই হিন্দুস্থানে শান্তি টিঁকতে দেওয়া হবে না বলে মনে হয় প্রতিজ্ঞা করেছে। এবং সেই চক্রান্ত পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান থেকে সহস্র সন্ত্রাসবাদী হিন্দুস্থানে ঢুকিয়েছে। হিন্দুস্থান শাসন এদের প্রতিরোধ করার কোন প্রভাবী উপায় যোজনা না করায় এই সন্ত্রাসবাদীরা মুম্বইর গল্লি থেকে দিল্লীর চাঁদ্‌নীচক্‌ পর্যন্ত সর্বত্র ভালোভাবে জমিয়ে বসেছে। জায়গায় জায়গায় মুসলিম সমাজকে ধর্মের দোহাই দিয়ে উত্তেজিত করার কাজ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করছে। তাই গত চার পাঁচ বছরের ঘটনা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, এমন একদিনও ছিল না যেদিন দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। এদেশের দুর্ভাগ্য মুসলমানদের উত্তেজিত করতে তারা সক্ষম হচ্ছে এবং এই সক্ষমতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এদেশের

অখন্ডতা আজ বিপদাপন্ন। এহচ্ছে সংখ্যালঘুদের তুষ্টিকরণ ও এদেশের হিন্দুদের আত্মাভিমান নষ্ট করার শাসকবর্গের পাপের ফল।

'উইক' নামের এক সাপ্তাহিক কেরল থেকে প্রকাশিত হয়, কেরলের মুসলমান 'অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' তাই এই সাপ্তাহিক মুসলমানদের, গতিবিধির উপর সবসময় নজর রাখে। এই সাপ্তাহিক বিভিন্ন সময়ে যে সব বৃত্তান্ত দিয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। 'যে করেই হোক দাঙ্গা ঘটাবোই' এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম গুজব ছড়িয়ে এই ধর্মান্ধ মুসলমানরা মীরাটে দাঙ্গা লাগিয়েছে। কোথাও কিছু না হওয়া সত্ত্বেও এরা গ্রামেগঞ্জে গুজব ছড়িয়েছে 'মুসলমানদের উপর আক্রমণ হচ্ছে'। মলিয়ানা গ্রামে যে দাঙ্গার আগুন জ্বলছে তার কারণ হচ্ছে এই ধর্মান্ধ মুসলমানদের গুজব। 'কলঞ্জুরী গ্রামে হিন্দুরা আগুন লাগিয়েছে তাতে আজিজ নামক মুসলমানের তেরো জনের সমস্ত পরিবার ভস্মসাৎ হয়েছে'। এই গুজব নিমেষে হাওয়ার বেগে ছড়িয়েছে। আর দাঙ্গার গতি হয়েছে আরও তীব্র। গুজবের কারণে ক্রুদ্ধ মুসলমানরা হিন্দুদের বস্তিতে আক্রমণ শুরু করল। আগুন লাগালো। পরে দেখা গেল আজিজের পরিবারে কারও গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচরও লাগেনি। সম্পূর্ণ পরিবার রয়েছে নিরাপদ। জিলা ন্যায়াধীশ শ্রী কৌশিক জানিয়েছেন মুসলমান নেতারা তিলকে তাল করে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়েছে। তাই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে।

এরকম অনেক প্রকার ঘটনা ঘটেছে। ঐ মৃতদের তালিকা মুসলমান নেতারা পুলিশের কাছেও দিয়েছে। রাজীব গান্ধী মীরাটে গেলে মুসলমানরা তাকে ঘিরে ধরে জানালো, হিন্দুরা চারশো মুসলমান মেরেছে। স্থানীয় মুসলমান নেতা বসীর আহমদ এইসব কাজে অগ্রগামী ছিল। কংগ্রেসের এম. এল. এ. শ্রী নানকচন্দ আজাদ জানিয়েছেন মৃতের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা গ্রাহ্য না করে প্রতি মৃত ব্যক্তির, নিকট-আত্মীয়কে বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। পুলিশ কমিশনার শ্রী গোপীনাথ দীক্ষিতের তালিকায় মৃতব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে মাত্র একশ এগারো জনের। এর মধ্যে সাতান্নজন পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে বলে যুব কংগ্রেসের অধ্যক্ষ মিরাজ্জুদিন সাথে সাথেই অভিযোগ করেছে। এই মুসলমান নেতারা জেলাশাসক দপ্তর থেকে সমস্ত মৃতব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণও আদায় করেছে। আর আজ—আজ সেই 'মৃত' ব্যক্তিরা ভূত হয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ আসলে সব মিলে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল বাইশ জন। চন্দ্রলোকের বশির খান যে তালিকা দিয়েছিল তাতে চাঁদ খানের নাম ছিল। বশির, জাল সই করে বিশ হাজার টাকা নেবার পর এখন চাঁদ খান গ্রামে উদয় হয়েছে। বশিরের তালিকার অনেক ভূত জীবন্ত হয়ে দিনদুপুরে মীরাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ভূতের খেলা দেখে সেখানকার পুলিশ, শাসকীয় অধিকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, কারণ বশির কোম্পানী ঐ ভূতদের নামে বিশ হাজার টাকা এর আগেই উশুল করে নিয়েছে। বশির ও তার সহকারীরা সরে পড়েছে। তারা সব কোথা থেকে এসেছিল আর কোথায় গেলো তা পুলিশও জানেনা, শুধুমাত্র দাঙ্গা

লাগাবার জন্য তারা এসেছিল। তাদের কাজ সেরে তারা সরে পড়েছে। এত কিছু হওয়ার পরও আমাদের শাসন মানতে রাজী নয় যে এদেশে দাঙ্গা বাঁধায় মুসলমানরাই। পাকিস্তান থেকে আগত রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দল এই মুসলমানদের মধ্যে মিশে গিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের উত্তেজিত করছে। কোথাও কোথাও হিন্দুদের উদ্দীপ্ত করছে। এই রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানরা চাইছে মহারাষ্ট্রেও মীরাটের পুনরাবৃত্তি করতে। 'লোকসত্তা'র হেমন্ত কূলকার্নী যে সমালোচনা করেছেন তা দেখে মনে হয় নাসিকে অত্যন্ত ভয়াবহ বাতাবরনের সৃষ্টি হচ্ছে। একসময় কুঁয়া বা পুকুরে পাউরুটির টুকরা ফেলে হিন্দুদের উত্তেজিত করা হত। এখন সার্বজনীন শৌচাগারে একখন্ড কোরান রেখে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলার নবীন ফন্দি এরা আবিষ্কার করেছে। আর দোষ চাপিয়েছে হিন্দুদের ঘাড়ে। কিন্তু, যে কোরান মসজিদে ইমামের জিম্মায় ছিল তা সার্বজনীন শৌচাগারে গেল কি করে এ প্রশ্ন ইমামকে কেউ করছে না। সমস্ত ইমামদের চরিত্র, ক্রিয়াকলাপের তদন্ত করা প্রয়োজন। মীরাটে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলছিল, ইমাম বুখারী তখন আগুনে ইন্ধন ঢালার জন্য সেখানে দৌড়েছিল। এদিকে যখন নাসিকের বাতাবরন উত্তেজনাপূর্ণ হাজী মস্তান সেখানে দৌড়েছে। কারণ ইমাম আর হাজী মস্তানের মধ্যে এখন আর বিশেষ পার্থক্য নেই। মস্তান নাসিকে গেল কেন? কি কাজ ছিল সেখানে? কার কার সাথে দেখা করল? কাকে কি নির্দেশ দিল? এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর আগে দেখা গেছে মস্তান যেখানে যেখানে গিয়েছে কালান্তরে সেখানে সেখানে দাঙ্গা হয়েছে।

এদেশে এ আর কতদিন চলবে? আর কতদিন সংখ্যালঘুদের তুষ্টিকরণ করা হবে? যার যার ধর্ম তার তার ঘরে, বাকি সর্বত্র সবাইকে ভারতীয় হয়েই থাকতে হবে একথা মুসলমানদের স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় বলার মত শাসক বা শাসনব্যবস্থা এদেশে কখনও হবে-না কি? এদেশে দাঙ্গা কারা বাঁধায় তা আজ আর কারও জানতে বাকি নেই। এর মূলে রয়েছে মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ মুসলমান। তাই দাঙ্গা মীরাটে হয় বানারসে হয় না। দাঙ্গা ভেন্ডিবাজারে হয়, কলকাতার খিদিরপুরে হয়, চাঁদনীচকে হয়, কোন হিন্দু গরিষ্ঠ এলাকায় হয় না। তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের 'ডোজ' গেলাতে হলে এই শিখন্ডী শাসন তা ঐ মুসলিম মহল্লায় গিয়ে গেলাবার সাহস দেখাক। না হয় 'সত্যমেব জয়তে'র সম্মান রেখে আসন খালি করুক। তারপর হিন্দুস্থানের সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, রাষ্ট্রীয় একতা কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা হিন্দুরাই দেখে নেবে। কারণ শাসন কর্তাদের হিন্দুত্ব নিঃশেষ হয়ে থাকলেও হিন্দুদের হিন্দুত্ব এখনও জীবন্ত। ঐ হিন্দুর হিন্দুত্বই দেশের সর্বত্র এই ক্ষেপা উন্মত্ত ভূতদের সমাধি দিতে পারবে।

"মার্মিক"—সতেরোই জুলাই ১৯৮৭

বন্ধ করো এই অপপ্রচার

"গর্বসে কহো-হাম্ হিন্দু হ্যায়" আমার এই সন্দেশ, শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই নয়, দেশের সমস্ত হিন্দু জনতার জপমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সর্বত্র সত্যিকারের হিন্দু জেগে উঠেছে ও দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও হিন্দুত্ব রক্ষার্থে একত্রিত হয়েছে। দেশের বিভ্রান্ত উদাসীন হিন্দু সমাজ কোন একটা অবলম্বন খুঁজছিল। শিবসেনা সেই ছত্র ধারণ করায় ত্রিশ কোটি হিন্দু আজ শিবসেনার পতাকাতলে সংগঠিত হতে চলেছে। এই প্রক্রিয়া পূর্ণ হতে সময় অনেক লাগলেও সেই কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। শীঘ্রই পৃথিবীর মানচিত্রে এবং ইতিহাসেও হিন্দুস্থান— "হিন্দুরাষ্ট্র" বলে অঙ্কিত হবে। এই পরিবর্তনের কৃতিত্ব যদি কেউ শিবসেনাকে দিতে চায় তা অবশ্যই দিক। আমি কিন্তু সেই কৃতিত্ব বিনম্রভাবে পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করছি। কারণ এই ভারতভূমির হিন্দুরা একত্রিত হোক, সংগঠিত হোক এবং সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শিবসেনার দ্বারাই হোক এও সেই মঙ্গলময়েরই ইচ্ছা। আর আজ আমি সেই শিবসেনার প্রধান এ হচ্ছে সমকালীন কার্যকারণ, যোগাযোগ মাত্র। তবুও সেই পরিবর্তন পরমেশ্বর আমার মাধ্যমে ঘটাচ্ছে সেই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

শিবসেনা স্থাপনের একটি ইঁট খুঁজে দেখলে তাতেও হিন্দুত্বের সুগন্ধ পাওয়া যাবে। ১৯৬৬ সনের ১৯ শে জুন আমি মুম্বই শহরে যে গেরুয়া পতাকা তুলে ধরেছিলাম, তা কোন পার্টির নয়। এই ধ্বজা, তিন শত বৎসর আগে সিদ্ধি প্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী রামদাস কর্তৃক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে হিন্দু ধর্ম স্থাপনার্থে দেওয়া আর্শীবাদ। সেই ধ্বজা যখন কাঁধে নিয়েছিলাম এই শিব ধনুষ্যের ভার সইতে পারব কিনা, সেই বিষয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু সে ভার আমাকে একা বইতে হয় নি। হাজারো শিব সৈনিকের হাত এগিয়ে এসে সেই ধ্বজা সাড়ম্বরে তুলে ধরলো।

শিবসেনার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয়। শিবসেনা রাজনৈতিক স্বার্থে মারাঠী নীতি ত্যাগ করে হিন্দুত্বের নীতি গ্রহণ করেছে। এ অভিযোগ অত্যন্ত বিদ্বেষমূলক ও যুক্তিহীন। মহারাষ্ট্রের মারাঠী জনতার আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে গঠিত শিবসেনা তার নীতি থেকে কিঞ্চিত সরে যায় নি। হিন্দুত্বের শিব ধনুষ্য কালের আহ্বান হিসাবে আজ কাঁধে নিয়েছি। আর তা করতে গিয়ে মারাঠী জনতা থেকে সরে গিয়ে থাকলে মহারাষ্ট্রের মানুষ ক্ষমা করত না। তা না হওয়ায় আজও মারাঠী মানুষ দৃঢ়ভাবে শিবসেনার পিছনে রয়েছে। আর তা ছাড়া হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনা নতুন করে উদয় হয় নি। তিনশত বৎসর আগে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্বপ্ন আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। এদেশের হিন্দু আজও রয়েছে উপেক্ষিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দুদের জন্য আইন তৈরী হয়েছে আর বিশেষ

অধিকার, বিশেষ সুবিধা এসব মাত্র দেওয়া হচ্ছে অহিন্দুদের। তাই চল্লিশ বছর ধরে হিন্দুরা মুখ বন্ধ করে মার খাচ্ছে। এ পরিস্থিতি দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না। কারণ রুদ্ধ বাষ্প সব সময়েই বেড়িয়ে আসার রাস্তা খোঁজে। সেই রাস্তা তৈরীর প্রয়াস অনেকেই করেছে। কিন্তু সেই প্রয়াসে স্বার্থান্বেষী দুর্গন্ধ ছিল। হিন্দু-ভোটের আশায় এদেশের অনেক পার্টিই অনেকবার অনেক রকম মুখোস পড়েছে—শিবসেনা নয়।

আজ দেশে যে হিন্দুত্বের ঢেউ উঠেছে তা একদিনে হয় নি। হিন্দু জনতাকে দীর্ঘকাল ধরে দাবিয়ে রাখায়, তাদের মধ্যে বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আর তাদের রক্ষা করার কেউ নেই এই ধরনের ভাবনাও হিন্দুদের মনে তৈরী হয়েছে। আবার এদিকে শাসকগোষ্ঠী সব সময় হিন্দুদের সাথে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে। "বহু বিবাহ আইন" থেকে শুরু করে "পরিবার পরিকল্পনা আইন" পর্যন্ত সব সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার্থে তৈরী করায় হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যা ও ঔদ্ধত্য এতো বেড়েছে যে ইমাম বুখারির মত উদ্ধত মানুষ "চৌদ্দ কোটি মুসলমান রাস্তায় নেমে এদেশের শাসন ব্যবস্থা দখল করবে" বলে ধম্‌কি দিতে সাহস পাচ্ছে। শহাবুদ্দীনের মত বিষাক্ত নাগ জনতা পার্টির ভোল ধরে সময়ে অসময়ে এদেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতার উপর দংশন করছে। এসমস্ত ঘটনা এমন মাত্রাতিরিক্ত হতে থাকায় দেশের হিন্দুদের একত্রিত না হয়ে আর গত্যান্তর রইল না। শিবসেনা হিন্দুদের কখনো উদ্দীপিতও করেনি বা উত্তেজিতও করেনি। কিন্তু বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজছিল, এই পরিস্থিতিতে শিবসেনা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

হিন্দুদের এই বেদনা শিবসেনা অনুভব করলো। হিন্দুদের এই আমন্ত্রণ, আহ্বান হিসাবে গ্রহণ করলো। আর তা করতে গিয়ে শিবসেনা নিজেদের উদ্দেশ্য বদলায় নি, ধ্বজাও না। "হিন্দু" এক পবিত্র ধর্ম। ধর্মের নামে রাজনীতি আমি অধর্ম মনে করি। তাই নির্বাচনের সাথে হিন্দুত্বের কোন সম্বন্ধ নেই। হিন্দু ধর্মের ঝুলি নিয়ে শিবসেনা ভোট ভিক্ষা করে—এই অভিযোগ যারা করে তাদের, ১৯৬৭ থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো খুলে দেখতে বলছি। থানে পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মুম্বই পৌরসভা পর্যন্ত যে যে কেল্লা জয় করেছি সে শুধু নিজেদের সামর্থে। আজ হিন্দুরা যে একত্রিত হয়েছে তা শিবসেনাকে ভোট দেওয়ার জন্য নয়—এদেশের হিন্দুত্ববাদ ও রাষ্ট্রবাদ প্রাণপণে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। আর এদেশের রাষ্ট্রবাদের পালন একমাত্র শিবসেনাই করতে পারে হিন্দুদের মনে আজ এই বিশ্বাস নির্মাণ হয়েছে।

কোনও কোনও সমালোচকের মতে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে নিরাশা থেকে। যদি তা সত্যিও হয় সে নিরাশার বীজ শিবসেনা নয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সময়ে পুঁতেছে। কংগ্রেস, সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাথায় চড়িয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী করেছে। তার ফলে এদেশের রাষ্ট্রপ্রেমী মুসলমানরা নিরাশায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। আর রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানদের অস্তিত্ব ঔদ্ধত্য এতো বেড়েছে যে এদেশে বসেই "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ঘোষণা দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কেবল মুসলমানদের

কারণেই দাঙ্গা হচ্ছে। খলিস্থান বাদীদের সাথে হিন্দুরা নয় মুসলমানরাই হাত মিলিয়েছে। পাকিস্তান থেকে হাজারো মুসলমান-গুন্ডা এদেশে এসে স্থায়ী হয়েছে, এদেশের শান্তি ভঙ্গ করতে। স্থানীয় মুসলমানদের সাথে যোগসজাশ করে তারা—অরাজগতার সৃষ্টি করছে। আজও যে দাঙ্গা হয় তা মুসলমান মহল্লাতেই হয়। হিন্দু মহল্লায় নয়।—যে বোমার কারখানা ধরা পড়ে তাও ঐ মুসলমান মহল্লায়। যেকোন সংবাদপত্র খুলে অপরাধের কলম পড়লে অপরাধীদের যে নাম দেখা যায় তারমধ্যে শতকরা নব্বই জন—আবদুল, রশিদ, কালিমুদ্দিন ইত্যাদি। অশোক, কালীচরণ ক্বচ্চিৎ দেখা যায়। এদেশের হিন্দুরা এসব আর কতদিন সহ্য করবে? এই সব দলবদ্ধ, সংগঠিত গুন্ডাগিরী ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে দেশের হিন্দু সমাজ যদি বিদ্রোহ করে তবে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব শিবসেনা গর্বের সাথে গ্রহণ করবে। এদেশের সংবিধানে যা কিছু লেখা থাকনা কেন আমার মতে এদেশ নির্মাণ করেছে হিন্দুরা এবং তা হিন্দুদের ও হিন্দুদের জন্যই থাকবে। এই দেশে হিন্দুদের সম্মান রাখতে হবে। তাই হিন্দুত্বের পতাকা আজ নয়, শিবসেনা প্রথম দিন থেকেই কাঁধে নিয়েছে। সেই পতাকায় যারা রাজনীতির গন্ধ পায় সেই শিবসেনা-দ্বেষীদের বলছি—বন্ধ করো এই অপপ্রচার।

"মার্মিক"—তেসরা জানুয়ারী ১৯৮৮

বুখারীকে ফাঁসি দেওয়া হোক!

এদেশের ভবিষ্যত কি? সে চিন্তা কেউ না করলেও আমি অবশ্যই করি। রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করে মধ্যবর্তী নির্বাচন করুক! সমস্ত বিরোধী পার্টিগুলি এই নিয়ে তান্ডব নৃত্য করছে। আমি অনেক সভায় বলেছি রাজীব গান্ধীর কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। সেই অরাজকতার ভয় আমার নেই। এদেশে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলেও হয়তো এই দেশ সেই অগ্নি পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসবে। কারণ এদেশ অনায়াসে স্বাধীনতা লাভ করেনি। এর পিছনে রয়েছে একশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। রয়েছে সহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও প্রচুর বিপ্লবীদের বলিদানের ইতিহাস। এদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হয়েছে ছাগলের দুধের বদলে নয় শহীদের রক্তের বদলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ক্ষমতালোভী নেতারা অধিকারের লালসায় সেই রক্তের সাথে বেইমানী করে এদেশের সওদা করল আর তা থেকে সৃষ্টি হল পাকিস্তান নামক ক্যান্সার। তাই স্বাধীনতার শঙ্খনাদ পরিণত হল এদেশের ত্যাগবাদের মৃত্যুনাদে।

সেই তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আজ চল্লিশ বছর হল। মুসলমানরা পেলো পাকিস্তান। হিন্দুরা কিন্তু হিন্দুস্থান পেলো না। তাই একদিকে ইসলামী পাকিস্তান আর একদিকে সর্বধর্মীয়দের ভারত নামক ধর্মশালা, এইরূপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন নকশা তৈরী হল। পরিণাম দাঁড়ালো এই, যে—আজ মুসলমানদের জন্য রইল পাকিস্তান থেকে শুরু করে সৌদী আরবিয়া পর্যন্ত ডজনখানেক দেশ। কিন্তু হিন্দুরা, হিন্দুদের জন্য তৈরী করা, হিন্দুদের, যা হিন্দুরা নিজেদের বলে দাবী করতে পারে এমন দেশ কোথায়ও রইল না। একটা ত্রাণশিবিরে যে ভাবে থাকা হয় চল্লিশ কোটি হিন্দু আজ সেইভাবে নিজেদের দেশে নিজেরাই নির্বাসিতের মত জীবনযাপন করছে। তাদের কোন মর্যাদা নেই, কোন অধিকার নেই আর কোন বিশেষ সুবিধাও নেই। সেই হিন্দুদের নিজেদের হিন্দুবলে পরিচয় দেওয়ার অনুমতিও নেই। ভোটের লালসায় রাজ্যকর্তারা আজ মুসলমানদের এত খোসামোদ করছে যে ঐ মুসলমানরা আজ ইসলামের নামে আগুন লাগিয়ে এই দেশ পুড়িয়ে ফেললেও সেই আগুনকে এরা দেবতার প্রদীপের মত পূজা করছে। যদিও উপ নির্বাচনে হিন্দুত্বের বিজয় হয়েছে তবুও এইসব ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে, বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করার মত মানসিক পরিস্থিতি আমার নেই। কারণ আজ কতগুলি বিষাক্ত সাপ এই দেশটাকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাদের বিষ অচিরেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। এদেশের সহজ সরল মুসলমান সমাজ নেতৃত্বহীন। ইসলামের দোহাই দিয়ে এদের ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার এক আন্তর্জাতিক

ষড়যন্ত্র কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে তৈরী হচ্ছে বলে বোঝা যাচ্ছে। যদি এই ষড়যন্ত্রকারী পাকিস্তান কিম্বা আফগানিস্থানের কেউ হত তাহলে আমি এব্যাপারে ততটা গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের প্রধান হচ্ছে এই দেশের জামা মসজিদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত দাম্ভিক ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বুখারী। এই বুখারী আজ এই দেশে বসবাস করে যে সব 'কর্তৃত্ব' করছে এইসব 'কর্তৃত্ব' যদি সে অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে বসে করত তাহলে আজ জীবিত থাকতো না। ইসলামী আইন অনুযায়ী যেকোন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে গুলি করে হত্যা করা হত। কারণ ইসলামী আইন ব্যবস্থা এইরকম। কিন্তু এদেশে যে রাষ্টদ্রোহ করে সে 'হীরো' হয় আর তারপর শাসনের পক্ষে সম্ভব হয় না তার বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার। জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ভিন্দ্রনওয়ালা। শিখদের ভোটের লালসায় শাসনকর্তারা এই ভষ্মাসুর পুষলো। শেষ পর্যন্ত সেই ভষ্মাসুর প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নিল। আজ ভিন্দ্রনওয়ালা জীবিত কি মৃত জানা নেই। তার ভূত কিন্তু অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নৃত্য করছে। জামা মসজিদের ইমাম বুখারীতো ভিন্দ্রনওয়ালার বাপ। বিগত বিশবছর ধরে যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছে এর পরেও তা সহ্য করা হলে ভবিষ্যত কাল আমাদের ক্ষমা করবে না। এই গভীর সঙ্কেত আমি আজই দিয়ে রাখছি।

এই বুখারী রামজন্মভূমি প্রসঙ্গে হুম্‌কি দিয়েছিল 'দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলবে' বলে। জনতা পার্টির শাসনকালে এই বিষকুম্ভ, মসজিদগুলো থেকে সাম্প্রদায়িক গরল ওগরাচ্ছিল। সেই সময় যারা সদাসর্বদা সর্বধর্মসমভাবের শ্লোগান দিয়ে বেড়ায় সেই তথাকথিত সমাজবাদীরা কিংবা যারা গণতন্ত্রের ঢোল পিটিয়ে বেড়ায় সেই কংগ্রেস-ওয়ালারা বুখারীর সেই হুম্‌কির বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারন করেনি। শুধু তাই নয় জনতা পার্টির স্বাভিমানশূন্য নেতারা গত নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে জামা মসজিদে গিয়ে বুখারীর সামনে নতমস্তক হল। তার ফলে এই মানুষের ঔদ্ধত্য এত বাড়লো যে দিল্লীর বোট ক্লাবের সমাবেশে উপস্থিত মুসলমানদের খোলাখুলিভাবে আক্রমক হিন্দুত্ববাদীদের হাত পা ভাঙ্গো বলে উস্কানী দিল। বাস্তবিক, শাসনের উচিত ছিল সেই দিনই ওকে গ্রেপ্তার করে অন্ধকার কারাগারে পাঠানো। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস ও অন্যসব বিরোধী পক্ষ এদেশের মুসলমানদের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। তাই এদেশের মাথায় দংশন করতে সদাসর্বদা প্রস্তুত শহাবুদ্দীন ও বুখারীর মত নাগেদের দমন করার মত শক্তি এদেশে আজ নেই।

শহাবুদ্দীন ও বুখারী এরা দুজন এরকম ধুম্রজাল সৃষ্টি করছে, যে এরা একজন আরএকজনের বিরুদ্ধে। কিন্তু আসলে এরা এক। আর এদের ষড়যন্ত্র শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও চলছে। চন্দ্রশেখরের মত একজন অকালকুষ্মান্ড সভাপতির আশ্রয়ে থেকে এই দেশটাকে খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ করার কাজ অব্যাহত চালিয়ে যাচ্ছে। এই শহাবুদ্দীন অষ্ট্রেলিয়ান বেতারের সাক্ষাতকারে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের ইসলাম রক্ষার্থে সংগঠিত হতে আহ্বান জানিয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জনের নির্লজ্জ আহ্বান করার সময়ও কলকাতার দৈনিক 'টেলিগ্রাফে' ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসকে "ওদের" মানে

হিন্দুদের প্রজাতন্ত্র দিবস, বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু 'সর্বধর্ম সম্ভাব' বাদী জনতা পার্টির সাহস হলনা ওকে একটা 'শোকজ' নোটিশ দেওয়ারও। তাই এই বিষবৃক্ষ এইভাবে বাড়তে থাকলো। আর এবারে জামা মসজিদের বুখারীতো সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গত দুই সপ্তাহ হল সে পাকিস্তান সফরে গেছে। বাস্তবিক এই ধরনের ভয়ানক মানুষকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াই অনুচিত। বুখারী পাকিস্তানে পৌঁছে যেন পাছায় আগুন লেগেছে এইভাবে ছোটাছুটি করছে। সেখানে মিটিং করছে আর পাকিস্তানের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ভারতের বিরুদ্ধে। মসজিদে মসজিদে গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের এই বলে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে যে 'ভারতের বিশ কোটি মুসলমান গোলামের মত জীবনযাপন করছে, তাদের গোলামগিরি থেকে মুক্ত করতে হবে।' শুধু তাই নয় বুখারীর ঔদ্ধত্য এত বেড়েছে যে হিন্দুস্থান শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, সাহস থাকলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে। মুসলমানদের মুক্তির জন্য সে ফাঁসিকাঠে ঝুলতেও রাজী।

বুখারীর এই ভারতবিরোধী বিচার বিবেচনা হীন বক্তব্যের ফলে পাকিস্তানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। উর্দু সংবাদপত্রগুলি বুখারীর এই অনিষ্টকারী প্রলাপ বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করাচ্ছে। বুখারীর এই জঘন্য কাজ 'এক পাগল ধর্মগুরুর পাগলামি' বলে উপেক্ষা করতে রাজী নই। কারণ পাকিস্তানের মসজিদে মসজিদের ভাষণে বুখারী বলছে 'আমরা মুসলমানরা ভারতেই থাকতে চাই'। আবার সাথে সাথে একথাও বলছে 'ভারতের বিশ কোটি মুসলমান সংগঠিত হয়ে ভারতের শাসন ব্যবস্থা দখল করুক'। এ থেকেই বোঝা যায় যে বুখারী কি চায়! বুখারী পাকিস্তান, পাকিস্তানই রাখতে চায় আর ভারতের শাসনব্যবস্থা দখল করে ভারতকে মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র বা দ্বিতীয় পাকিস্তান বানাতে চায়। তার এই আসুরী ইচ্ছা পূরণ করার কাজে অন্যদেশের মুসলমানদের সাহায্য যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের ভারতের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' এর জন্য উত্তেজিত করছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, এরপরেও আমাদের শাসনকর্তারা একে গ্রেপ্তার করবে না কি? বাস্তবিক এই মুসলমান ধর্মগুরুরা নিজেদের ধর্মপীঠের আশ্রয়ে, ধর্মপীঠকে ব্যবহার করে যখন যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, হিন্দুধর্মগুরুদেরও উচিত তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করা। কিন্তু আমাদের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তা করেন না। তাই ভিলেপার্লার উপ-নির্বাচনে হিন্দুত্বের আহ্বান করে হিন্দুদের একজোট করে আমাকেই তা করতে হল। আমাদের সমস্ত ধর্মগুরুরা যদি একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়ায় তাহলে সমস্ত হিন্দু সংগঠিত হয়ে তাঁদের পিছনে দাঁড়াবে আর এদেশের আক্রমক মুসলমানদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু তা কোনদিন হয়নি। আর হবেও না। তার পরিণাম দাঁড়িয়েছে এই যে 'বিশ কোটি মুসলমান দেশের অধিকার কব্জা করুক আর অন্যদেশের মুসলমানরা তাদের সেই কাজে সাহায্য করুক' এই আহ্বান করার মত দুঃসাহস বুখারীর মত দেশদ্রোহীরা দেখাতে পারছে একাজে বুখারী নিঃসঙ্গ নয়। তার

সাথে রয়েছে শহাবুদ্দীনের মত অন্তত ডজনখানেক বিষাক্ত নাগ। আর জামা মসজিদ পরিণত হয়েছে এদের 'খলবতখানায়'। হিন্দু মন্দির, মসজিদে পরিণত করা আর বিশ কোটি মুসলমান এদেশের অধিকার দখল করার ষড়যন্ত্র এই জামা মসজিদে বসেই পরিপক্ক হয়। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় দেশে দ্বিতীয় ভিন্দ্রনওয়ালা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম ভিন্দ্রনওয়ালা দাবী করল খলিস্থান। আর দ্বিতীয় ভিন্দ্রনওয়ালা বিশ কোটি মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণ হিন্দুস্থান চাইছে। এক ভিন্দ্রনওয়ালার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় দেশের প্রধানমন্ত্রী খোয়াতে হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় মহাভয়ংকর ভিন্দ্রনওয়ালার জন্য এইভাবে খোলা ময়দান ছেড়ে দিলে সম্পূর্ণ দেশ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই অনতিবিলম্বে বুখারীর বিষদাঁত ভাঙা প্রয়োজন। এই শিশুপালের অপরাধের সংখ্যা একশ হয়ে গেছে। তাই আর ক্ষমা নয়। পাকিস্তানে ভারতবিরোধী ঘাঁটি তৈরী করে তাতে জিয়া ও বেনজির সামিল হওয়ার আগেই বুখারীকে ধ্বংস করতে হবে। তাই ভারত শাসনের কর্তব্য জামা মসজিদে পাহারা বসিয়ে সেখানকার মুষ্টিমেয় মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের আড্ডা বিধ্বস্ত করা আর বুখারী পাকিস্তান থেকে ফেরা মাত্রই তাকে হাতকড়ি পরিয়ে জনগণের সামনে অপমানিত করতে করতে ন্যায়ালয়ে উপস্থিত করা। এই দেশের সংবিধানে দেশদ্রোহের সাজা-প্রাণদন্ড। তাই এই দেশে নিজের রাজত্ব বিস্তারে উৎসুক রাষ্ট্রদ্রোহী শাহেনশাহ্ বুখারীকে জনসমক্ষে জামা মসজিদের সম্মুখেই ফাঁসি দেওয়া হলে আর কারও ভারতের দিকে হিংস্র নজরে তাকাবার সাহস হবে না।

যারা হিন্দুধর্ম ছেড়ে গেছে তাদের আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনতে হবে, আর আনা যাবেও। অন্যথায় আমাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। যখন মুসলমানরা এদেশে এসেছিল সেই সময়কার সর্বপ্রাচীন মুসলিম ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ষাট কোটি। এখন আমাদের সংখ্যা কুড়ি কোটির মত। এখন হিন্দু সমাজ থেকে যারা বেড়িয়ে যাচ্ছে তারা সংখ্যাই কমাচ্ছে তা নয়, তারা শত্রুবৃদ্ধিও ঘটাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

They count their Gains,
We calculate our Losses
লেখক—শ্রী ইন্দ্র প্রকাশ।

হিন্দুস্থান স্থাপনার্থে বাঁচতে হবে

তেইশে জানুয়ারী আমার জন্মদিন। শিবসৈনিকরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উদ্‌যাপন করে। সকাল থেকেই দলে দলে আসতে থাকে। বারণ করলেও শোনেনা, ফুলমালা, ফুলের তোড়া নিয়ে আসে। বিকেলে সন্‌মুখানন্দ হল-এ অনুষ্ঠান হয়। গত বিশ বছর ধরে এই রকমই চলেছে। এই জন্মদিন উদ্‌যাপন করার মানে আমি বুঝি না, আর অভিনন্দনের কারণও। মানুষ জন্মায়, বড় হতে থাকে কারণ বড় না হওয়া কারও হাতে নেই। শুধু মানুষই না, প্রাণীমাত্র বাড়তে থাকে আর গাছপালাও পুরাতন হতে থাকে। তবুও জন্মদিন কেবলমাত্র মানুষেরই পালন করা হয়, তার কারণ বৃক্ষ ও প্রাণী মাত্রেরই থাকে শুধু বেদনা আর মানুষের থাকে অসন্দিগ্ধ জ্ঞান বা অনুভব অর্থাৎ সংবেদনা।

শিবসেনা, মারাঠী মানুষের বেদনা থেকে নির্মিত সংবেদনার এক সত্যাবিষ্কার। সেই সত্য আমার মুখ থেকেই সবাই জানুক এ হচ্ছে সেই সর্বশক্তিমান অজ্ঞাত শক্তির ইচ্ছা। সেই অজ্ঞাত শক্তি মা জগদম্বাও হতে পারেন, দেবী একবিরাও হতে পারেন কিংবা কোলাপুরের মা অম্বাদেবীও হতে পারেন। যিনিই হোন না কেন সেই অজ্ঞাত শক্তিই আমাকে আমার ব্যক্তিগত জীবনে সতত সামর্থ্য যোগান ; যাতে আমি সব সংকটের মোকাবিলা করতে পারি। কারো বিশ্বাস থাক বা না থাক সেই শক্তির উপর আমার দারুণ বিশ্বাস—কারণ শ্রদ্ধা ছাড়া মানুষ কখনও মানুষ হিসাবে বাঁচতেই পারে না ; এ মনুষ্য জীবনের সাংকেতিক সিদ্ধান্ত। যে এই সিদ্ধান্ত মানে না সে মনুষ্য ধর্ম হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু আমাকে মানবতা খোয়ালে চলবে না—কারণ 'মানবিকতা' এই হচ্ছে আমার সামাজিক জীবনের ও শিবসেনার কেন্দ্রবিন্দু। আমি জীবনে কিছু জমা করতে পারি আর না পারি মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক ক্ষেত্রে—তা সাহিত্যক্ষেত্র হোক বা নাট্যক্ষেত্র, সঙ্গীতক্ষেত্র হোক বা ক্রীড়াক্ষেত্র এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে ক্ষেত্রের মানুষের সাথে আমি সম্পর্ক জুড়িনি। শিবসেনা মানেই তো হচ্ছে মানুষের এক বিরাট সাগর। এই সমস্ত মানুষের সাথে আমি সম্পর্ক জুড়তে পেরেছি কারণ আমার জন্মদাতা আমাকে স্বাভিমান শিখিয়েছে কিন্তু অহংকার শেখায়নি। তাই মান-সম্মান জুটেছে অনেক কিন্তু কোনও দিন গর্বে মাথা ঘুরে যায় নি। মানুষের ভিড়ে থাকতে থাকতে যা ভালো লেগেছে আনন্দে তুলে নিয়েছি, কিন্তু তা করতে গিয়েও কোনদিন ব্যভিচার করিনি। আজ পর্যন্ত আমার অনেক জন্মদিন আমি নির্বিকার ভাবে উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আজকের জন্মদিনে আমি জীবনের এক মহত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। আগামী দিনে শুরু হবে নতুন পথ চলা।

অতীত কালের দিকে একবার শেষবারের মত নিমেষে তাকিয়ে আগামী কাল থেকে এগিয়ে যেতে হবে। সামনে অনেক আবেদন ও অনেক আহ্বান হাত জোর করে ও মুষ্টি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় আগে বাড়বো কি পিছে হটবো এ ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চিন্তা জীবনে কোনদিন আমার মনে স্থান পায়নি ; কারণ—পিছে হাঁটা আমার রক্তেই নেই। গত ষাট বছরের জীবনে অনেক বিবর্তন এসেছে, সংকট এসেছে। শিবসেনা স্থাপনের পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে সংকটের পাহাড় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেই সব পাহাড় পার করে এতদূর পৌঁচেছি। হোঁচট খেয়েছি, আঘাত পেয়েছি, কখনও কখনও হতবুদ্ধিও হয়েছি। কিন্তু তবুও পথচলা থামেনি। সম্মুখে চলতেই থেকেছি, কিন্তু এর কৃতিত্ব আমার নিজের একার প্রাপ্য নয় সাংসারিক জীবনে যখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখন বাবার আদর্শ সামনে রেখেই চলেছি। বাবা আজ নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ রয়েছে। শিবসেনার চলার পথ কখনও মসৃণ ছিল না ; ছিল কন্টকময়। তবুও যা কিছুই করিনা কেন আমার সহকর্মীরা তো সব সময় সর্বত্র সঙ্গী ছিলই তাছাড়া আরো ছিল হাজারো, লাখো শিবসৈনিক। আর তা আজ শুধু মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এ যা কিছু ঘটেছে তা শুধু আমার একার কৃতিত্ব নয় ; এর পেছনে রয়েছে সমস্ত শিব সৈনিকদের সামর্থ্য, তাদের ত্যাগ। ভবিষ্যতের রাস্তা ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু যেখানে যেখানে শিবসৈনিক গেছে সেখানেই পায়ে হাঁটা ছোট রাস্তা তৈরী হয়েছে আর সেই রাস্তায় চলতে চলতে আজ সেই রাস্তা প্রশস্ত রাজপথে পরিণত হয়েছে।

আমি সেই রাজপথে এক ভাগ্যবান ধর্মযাত্রী, যদিও হিন্দুধর্মের পতাকা আমি আজ কাঁধে নিয়েছি তবুও তা কেবল আমার একারই এ দাবী আমি কখনও করব না। এদেশে যে সব হিন্দু আছে তাদের সবার এতে অধিকার রয়েছে। কারণ এই হচ্ছে তাদের পতাকা, এই হচ্ছে ত্রাতা, এই আধার। আর এই হচ্ছে তাদের ভবিষ্যতের প্রকাশ। তাই আমার ইচ্ছা এদেশের সমস্ত হিন্দু একশ বছরের অন্ধকার মুছে ফেলে এই পতাকার তলায় একত্রিত হোক। এখানে কাউকে কারো আনুগত্য মানবার প্রয়োজন নেই, নিয়মানুবর্ত্তিতার অবশ্য প্রয়োজন। নিজের নেতৃত্বও জোর করে অপরের উপর চাপাবোনা। আমার নেতৃত্বের লোভ নেই, কারণ মানুষ মাত্রই নশ্বর, আমি আজ আছি কাল থাকবো কি থাকবোনা কে জানে? কিন্তু ভগবৎ ভক্তির ধর্মের ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের এই ধ্বজা যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য, তারা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে সসম্মানে দৃঢ়তার সাথে উড়বে। কারণ এই ধর্ম-ধ্বজা কোন দর্শনীয় বস্তু নয়. এ হচ্ছে তিনশ বছর আগে স্বামী রামদাসের দ্বারা শিবাজী মহারাজকে দেওয়া এক শক্তিশালী আশীর্বাদ। যদিও হিন্দুধর্ম রক্ষার সামর্থ এই ধ্বজায় আছে তবুও এই ধ্বজা—উদারতার, নিরপেক্ষতার, নিঃস্বার্থতার মূর্ত প্রতীক। অধিকার লোলুপ রাজ্য-কর্তারা এই ধ্বজের ভার সইতে না পারায় বিধাতা সে দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপালেন।

জীবনে কখনও আমি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার অভিলাষী নই। শিবসেনা বেড়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারে এসেছে, সহযোগীরা সার্বজনীক জীবনে স্বীকৃতি

লাভ করেছে, অনেকে অনেক ক্ষেত্রে অধিকার গ্রহণ করেছে আমি তাতেই খুশী। আধিকার পদ সব সময় এড়িয়ে চলেছি। নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছি। ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রে রাজ্য শাসন শিবসেনার হাতে এলেও (তা আসবে এও নিশ্চিত) তাতে আমি কোন অধিকারপদ গ্রহণ করবনা, এই হচ্ছে আমার নীতি। এই হচ্ছে আমার মত। কোনদিন এর খেলাপ হবে না।

জীবনে কিছুই পাইনি অথচ পাওয়ার কিছুই বাকি নেই তবুও বেঁচে থাকার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে, কারণ 'পাওয়া' এই শব্দের ব্যাখ্যা আমার কাছে ভিন্ন। মহারাষ্ট্রের মানুষ যা পেয়েছে তা আমিই পেয়েছি। শিবসেনা যা পেয়েছে সেও আমারই পাওয়া। হিন্দুরা যা পেয়েছে সেওতো আমার লাভ, আর হিন্দুস্থান যা পেয়েছে তাতেও রয়েছে আমার অধিকার। তাই আমি আজ পর্যন্ত যা যা পেয়েছি সব এদের চরণে অর্পণ করেছি ; কারণ আজ, এক ব্যক্তি হিসাবে একা বাঁচা, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আজ আর আমার নিজের জন্য নয়, কারণ হিন্দুত্বের পালে হাওয়া লেগেছে—জাহাজ যে দিকে যাবে আমিও সেই দিকে। তবে হাল কিন্তু নিজের হাতেই রাখবো। ঢেউ আসুক, তুফান আসুক হাল ছাড়ছিনা আর জাহাজও না। চারশো বছর আগে ভাস্কো-দ্য-গামা হিন্দুস্থান আবিষ্কার করল কিন্তু প্রকৃত অর্থে হিন্দুস্থান কখনো হয়নি। আমাদের সেই হিন্দুস্থান গঠন করতে হবে। **হিন্দুর—হিন্দুস্থান স্থাপন করতে হবে। যেখানে হিন্দুর মান রাখা হবে, যেখানে হিন্দুধর্মের গৌরব, হিন্দুধর্মের মর্যাদা রাখা হবে আর হিন্দুত্বের সামনে অহিন্দুও নতমস্তক হবে—সেই হিন্দুস্থান তৈরী করতে হবে। সেই হিন্দুস্থানের স্বপ্ন সফল করতে হলে হিন্দুত্বের পতাকা হাতে নিতে হবে হিন্দুদেরই, সংঘবদ্ধ হয়ে, দ্বেষ, বিদ্বেষ ভুলে।** আমার জীবনের এই একমাত্র স্বপ্ন অপূর্ণ রয়েছে। সেই স্বপ্ন নিয়েই জন্মেছিলাম। জীবনের কতটা পেরিয়ে গেলো কতটা বাকি—এ হিসাব না রাখলেও জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো হিন্দুত্বের চরণে অর্পণ করছি। তাই নিজের জন্য নয় ঐ হিন্দুত্ব পূর্তির জন্য আমাকে বাঁচতে হবে—আর আমি বেঁচে থাকবোই। আমার জন্মদিনের উৎসব এই কথাই সোচ্চারে জানাবে।

হ্যাঁ এ হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র

হ্যাঁ 'এ হচ্ছে হিন্দু রাষ্ট্র' এই সত্য আজ ভারত স্বাধীন হওয়ার বিয়াল্লিশ বছর পরও বলতে হয় এর চেয়ে দুর্দৈব আর কিছু নেই। কিন্তু দেশের হালচাল সম্পূর্ণ বদলাচ্ছে আর 'হ্যাঁ আমি হিন্দুই' একথা সোচ্চারে বলার সাহস নেতাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে। এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। "গর্ব সে কহো হাম্ হিন্দু হায়", লক্ষ লক্ষ লোকের এই গগনভেদী আর্তনাদ শুনলে মন আনন্দে ভরে ওঠে কারণ দেশে বিশেষত মহারাষ্ট্রে এই ভাবনা জাগ্রত ও প্রজ্জলিত করার কাজে শিবসেনার সিংহভাগ রয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গত বৃহস্পতিবার দাদরের শিবাজী ময়দানে ডঃ হেড্‌গেবার জন্মশতাব্দী নিমিত্ত যে মনোরম অনুষ্ঠান হল তা থেকে দেশে নবচৈতন্যের সৃষ্টি হবে এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এই নিমিত্তে জ্বলন্ত হিন্দুত্ববাদের যে দর্শন ঘটল তা সত্যিই মনমুগ্ধকর। ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী, হিন্দুস্থানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে যাকে কিছুদিন আগে গুরুত্ব ও সম্মান জানিয়েছেন সেই অটলবিহারী বাজপেয়ী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তার উপস্থিতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে বেশ কয়েক বছর তিনি মুম্বই আসেননি। আর তার বিচার ধারা 'জ্বলন্ত হিন্দুত্ববাদ থেকে গান্ধীবাদের দিকে ঝুঁকছে' এ ধরনের সমালোচনা অনেক ইংরাজী সংবাদপত্রে দেখা গেছে। কিন্তু এই সভায় তার ভাষণে অনেক শংকা দুর হয়েছে। শ্রী পাণ্ডুরঙ্গ শাস্ত্রী আঠওলের মত তেজস্বী পুরুষের ওজস্বীনি বিচার শোনবার জন্যও এই সমাবেশে হাজারো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জমা হয়েছিলো, একথাও স্বীকার করতে হবে। সমাজসেবায়, উৎসর্গিত অনেক ত্যাগীপুরুষের জীবনের পথচলা মানেই বহু দুঃখজনক ঘটনার মোকাবিলা করা। কিন্তু সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে স্বর্গীয় হেড্‌গেবার কে ভাগ্যশালী বলতে হবে। জীবনের অন্তিম লগ্নে তিনি একদিন বলেছিলেন "হিন্দুত্ববাদের যে বিচার ধারা সামনে রেখে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্থাপনা করেছি, সেই হিন্দুত্ববাদ এইদেশে বিস্তার লাভ করবে। সেই চিত্র আজই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখকর ঘটনা" এবারের নতুন বছরের প্রথম দিনের এই বিশাল সমাবেশ তার আশা পূর্ণ করেছে এবং তা দেখে তার আত্মা সত্যিই শান্তি লাভ করেছে এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নববর্ষের প্রথম দিনের এই হিন্দু সম্মেলনে সাংসদ বাজপেয়ী হিন্দুস্থানের মিশনারী সংস্থাগুলি বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে জানিয়ে সেই টাকা আসা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানালেন। এ বিষয়ে যা জানা গেছে তার বিবরণ লোকসভায় পরিবেশন করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন ১৯৮৪ সালে

৩৬১২টা মিশনারী সংস্থা দুই অর্বুদ তিপান্ন কোটি আটান্ন লাখ বিরানব্বই হাজার ছয়শ টাকা পেয়েছিল আর ১৯৮৬তে ৫৪০১টা মিশনারী সংস্থার খাতায় জমা হয়েছে চার অর্বুদ আটত্রিশ কোটি সাতাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা। এ থেকে বোঝা যায় মিশনারী সংস্থাগুলি এদেশে কি ভাবে জাল বিস্তার করছে। আর এসব খোলাখুলি ভাবে হওয়া সত্বেও সম্পূর্ণ দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি—এজন্য তিনি চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মুম্বই থেকে এক কোটি টাকা জমা হয়েছে আরো পঁচিশ লাখ টাকা জমা করা হবে বলে শত বার্ষিকী সমিতির মুম্বই বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী বীরেন শাহ্ জানিয়েছেন। এই সভায় অটল বিহারীজী যে আর দুই বিষয়ে বলেছেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাম, এই ভূমিতে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন আর বাবর এক আক্রমণকারী হিসাবে তুর্কস্থান থেকে হিন্দুস্থানে এসেছে। এই কথা বলে তিনি রামজন্মভূমি ও বাবরী মসজিদ বিবাদ 'মুসলমানদের একগুয়েমীর চরমসীমা' বলে মত প্রদর্শন করেছেন। যে প্রধানমন্ত্রী, বিভীষণ, কে—তাই চেনেনা, সে রাম কি করে জানবে? বাজপেয়ী একথা বলার সাথে সাথে শ্রোতারা প্রচন্ড হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। এই সভায় তিনি 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব' বলে দৃঢ় ভাষায় ঘোষণা করলেন, আর একথাও বললেন যে যদি কেউ নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে তাহলেও তার কিংবা অন্য হিন্দুদের নিজেদের বলতে হিন্দুস্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান নেই।

যাইহোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে মুসলিম ভোটের তোয়াক্কা না করে 'হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক' করতে হবে। 'সেক্যুলারিজমের' নাম করে এদেশে আজ পর্যন্ত মুসলিম তুষ্টিকরণের যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস জঘন্য ভাবে চলছে হিন্দুসমাজকে আজ তা উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। "যে হিন্দুস্থানের আনুগত্য মানবে সেই হিন্দু আর হিন্দুস্থানী" এই আমার ভূমিকা। এই বিচারধারা নিয়ে এই মত প্রচারে আমি সম্পূর্ণ দেশ চষে ফেলবো। এ অত্যন্ত সন্তোষজনক যে, আজ ভারতীয় জনতা পার্টি খোলাখুলি নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় হিন্দুত্বের ধ্বজা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে। এই চলার পথে আরও অনেক প্রবাহ সামিল হবে। আমি তাদের স্বাগত জানাবো।

“মার্মিক”—নয়ই জুলাই ১৯৮৯

পাকিস্তানে সৈন্য ঢোকানো হোক

পাঞ্জাবের মোগায় যে হত্যাকান্ড হল সেই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবিবার বিরাট মৌনমিছিল বেরোলো আর সোমবার মহারাষ্ট্রে হরতালও পালন করা হল। আমার রাজনৈতিক বিরোধীরা প্রশ্ন করছে এই সব করে হত্যাকান্ড বন্ধ হবে কি? তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সামান্য কারণে জনতাকে পাকে ফেলে যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করে, সেই দুই কড়ির মানুষদের, আমাকে এ প্রশ্ন করার নৈতিক অধিকার নেই। কিন্তু তবুও জনগণের অবগতির জন্য আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি আর আজও স্পষ্টভাবে বলছি—এ ধরনের মিছিল ও হরতালে আমার বিশ্বাস নেই। তবুও কখনও কখনও জনতার ভাবনা প্রকাশ করার জন্য এই ধরনের আন্দোলনাত্মক কার্য্যক্রম করতেই হয়। এই করে পাঞ্জাবের হত্যাকান্ড বন্ধ হবে না একথা ঐ তথাকথিত সমাজবাদীদের কাছ থেকে আমায় শিখতে হবে না। খলিস্থানবাদীরা মনুষ্য রক্ত লোলুপ পশু। তাদের মনে এসব কোনরকম রেখাপাত করবে না। তাদের মোকাবিলা অস্ত্র দ্বারাই করতে হবে। তার জন্য শাসনেরই উচিৎ শিবসেনা, আর. এস. এস-এর শাখা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করা। পুলিশ ও সৈন্য দিয়েও এদের বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে না। তাই সীমান্তের নিরাপদ নয় এমন গ্রামের প্রতি ঘর থেকে একজনকে অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শী করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই গণ-ফৌজ তৈরী হবে না ততদিন পর্যন্ত নিরীহ লোকের রক্তের নদী এইভাবে বইতেই থাকবে।

এ সূচনা নতুন নয়। ইরাক যখন ইরান দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন সেখানকার নাগরিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করা হল। ইস্রাইলে তো কেবলমাত্র মহিলাদেরই নয় বারো বছরের উর্ধ্বে বাচ্চাদেরও ষ্টেনগান দেওয়া হল। অংগোলাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সৈনিকি শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। আজ সেখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরাও কাঁধে ষ্টেনগান নিয়ে রাস্তায় ঘোরে। যা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে সম্ভব তা আমাদের পাঞ্জাব সীমান্তে মাত্র তিনটি ছোট্টগ্রামে কেন সম্ভব হচ্ছে না? নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে কংগ্রেস শাসন চায় হত্যাকান্ড এইরকম চলতে থাকুক, না হয় ইচ্ছে করলে তিনদিনে এই খলিস্থানীদের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। খলিস্থানীরা পাকিস্তানে অস্ত্র শিক্ষা নিয়ে সশস্ত্র হয়ে পাঞ্জাবে আসে। তাই পাঞ্জাবে ভারতের এলাকায় পাকিস্তানের সম্পূর্ণ সীমানা জুড়ে দুই কিলোমিটার প্রশস্ত ‘মনুষ্য বিহীন অংশ’ নির্মাণ করা হোক—এই ধরনের প্রস্তাব রাজ্যসভায় মঞ্জুর হয়েছে আজ চৌদ্দ মাস হল; কিন্তু আজ পর্যন্ত চৌদ্দ ইঞ্চি জায়গাও রাজীব গান্ধী ‘মনুষ্য বিহীন’ করেনি।

খলিস্থানের সমস্যা আজ আর রাজনৈতিক সমস্যা নয় ; তার রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চরমপন্থীরা হিন্দুস্থানী নয়, পাকিস্তানী নয়, খলিস্থানীও না—এরা হচ্ছে হিন্দুস্থানে পাঠানো পাকিস্তানের ভাড়াটিয়া গুন্ডা, এদের জাত নেই, পাত নেই, ধর্ম নেই—এরা মানুষও না, এরা জানোয়ার। এই জানোয়ারেরা গত এক বছরে সহস্রাধিক নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে। রাজ্যপাল সিদ্ধার্থশংকর রায় ঘোষণা করেছেন মোগা হত্যাকান্ডের অপরাধীদের আট দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হবে। এই সম্পাদকীয় যখন লিখছি তখন সাত দিন পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু হত্যাকারীদের একগাছা চুলও কেউ বাঁকা করতে পারেনি। হরিন্দর বায়েজার বার্তাপত্র এই মাত্র এসে পৌঁছালো যাতে এই চরমপন্থীদের আসল রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তাপত্রের কিছু সংবাদ শোচনীয়। আবার পাঞ্জাব পুলিশের ডাইরেক্টর জেলারেল শ্রী এস. পি. গিল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন পাকিস্তানের প্রশিক্ষণ শিবির খালি হয়ে যাচ্ছে, যথেষ্ট পরিমাণ শিখ তরুণ পাওয়া যাচ্ছেনা। তিনি আরও জানিয়েছেন, যে সব চরমপন্থীরা পূর্বে খলিস্থান দাবী করছিল তারা সেই দল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দুই লাখ টাকা দাবী করছে আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ দর কাযাকষি করে বিশহাজার টাকা নিয়েও অস্ত্র পরিত্যাগ করছে। যেহেতু শ্রী গিল এর মত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি একথা বলছেন তাই সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়। তার মানে আমি এতদিন ধরে যে বলছি—এই চরমপন্থীরা কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী নয়, এরা হচ্ছে হিন্দুস্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানের ভাড়াটিয়া গুন্ডা, একথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হল। পাকিস্তান তাদের অস্ত্র দেয়, অস্ত্রশিক্ষাও দেয়। এখন এই সব সন্ত্রাসবাদীরা শিখদের উপরও হল্লা করে, আর মেয়েদের বলাৎকারও করে। এও দেখা গেছে যে, যে সব তরুণরা ধরা পড়ছে তাদের মধ্যে অনেকেই শিখ নয়। তার মানে খলিস্থানী আন্দোলনের বোরখা ছিঁড়ে গিয়ে তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে। আর যা দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, এ হল পাকিস্তানের ভাড়াটিয়া গুন্ডা দ্বারা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে আরম্ভ করা যুদ্ধ।

তাহলে আর প্রতীক্ষা কেন? পাঞ্জাবের বেকার তরুণদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে তাদের অর্থ, অস্ত্র এবং অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য, হত্যাকান্ড করার জন্য হিন্দুস্থানে পাঠানো হয়—এ যদি আজ স্পষ্ট বোঝাই যায় তাহলে তা আজ আর শিখেদের ধার্মিক আন্দোলন হতে পারে না। এ খলিস্থানের আন্দোলন নয়, এ হচ্ছে পাকিস্তান দ্বারা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ। তাই আমার প্রশ্ন আর দেরি কেন? এদেশের আত্মসম্মান সামান্যও যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে নিঃশঙ্কোচে হিন্দুস্থানের সৈন্য পাকিস্তানে ঢুকিয়ে সেখানকার চরমপন্থীদের শিক্ষা-শিবির ধ্বংস করা হোক। আমাদের সৈন্য, হায়দ্রাবাদের রজাকারদের মত তিনদিনের মধ্যে এদের নিয়ন্ত্রণে আনবে। তাতে পাকিস্তানের যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তার জবাবদারী বেনজীর বিবির, কারণ জনাব ভুট্টো, জনাব জিয়া ও বিবি বেনজীর এদের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখছিনা। বিবিধ চেহারা ও বিবিধ ছদ্মবেশ পরা সব পাকিস্তানী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের রক্ত এক,

চিন্তাও এক—হিন্দুস্থান বিদ্বেষ। তাই এদের বিরুদ্ধে একই ভাষা ব্যবহার করতে হবে—তা হচ্ছে যুদ্ধের ভাষা। তাই পাকিস্তানকে শিক্ষা-শিবির তিনদিনের মধ্যে বন্ধ করার জন্য শেষ বারের মত সতর্কীকরণ করে নির্ধারিত সময় শেষ হলে পাকিস্তানে সৈন্য ঢুকিয়ে চরমপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হবে, তার জন্য আর কাল বিলম্ব নয়, না হয় আজ সংঘ শাখার উপর আক্রমণ হল, কাল হয়তো শিবসেনা শাখার উপর আক্রমণ হবে। আর শিবসেনা শাখার উপর আক্রমণ হলে তার পরিণাম কি হবে তা কি লেখার প্রয়োজন আছে?

"ধর্মান্তর মানেই রাষ্ট্রান্তর"

বীর সাবরকার

"সামনা"—চোদ্দই জুলাই ১৯৯২

এরা সব চুনো পুঁটি

বাবর জন্মাবার অনেক আগে থেকেই শ্রী রামচন্দ্রের, অযোধ্যা নগরীর অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু যেহেতু ধর্মান্ধ শহাবুদ্দীন আর ইমাম বুখারী একথা স্বীকার করছে না তাই হিন্দুস্থান শাসন আর ন্যায়ালয়ও তা মানতে রাজী নয়! তাই এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আযোধ্যা বিষয় নিয়ে হিন্দুস্থানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তা মোটেই সুখকর নয়। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নির্মাণ, এ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় তো বটেই, হিন্দুস্থানের পরম্পরা আর সংস্কৃতিও রয়েছে এর সাথে জড়িত। নয়ই জুলাই অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হতেই বিদেশী বাবরের বংশধররা তাদের বিযাক্ত ফণা আবার তুলতে শুরু করেছে! শহাবুদ্দিন ঘোষণা করেছে "রাম মন্দির নির্মাণ করা হলে মুসলমানরা বন্দুক হাতে নেবে।" আবার ঐ দিকে শাহী ইমামও ঘোষণা করেছে "বাবরি মসজিদের একটা ইঁটের গায়ে ধাক্কা লাগলে সমস্ত হিন্দুস্থানে রক্ত নদী বইবে।" আমাদের সরকার ও দেশের জনতা শহাবুদ্দিন আর ইমামের এই বক্তব্য শুনেও শান্ত রয়েছে! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিৎ ছিল ঐ শহাবুদ্দীন আর ইমাম বুখারীর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা। কিন্তু তা হবার নয় ; কারণ মুসলমানরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে! তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় একাত্মতার "টেপ" বাজাতে শুরু করলেন। দুজন তুচ্ছ মুসলমান দেশের সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে আর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সামনে নতজানু হচ্ছে! একে কি বলা হবে? আমি অনেকবার বলেছি আর আজও পরিষ্কার ভাবে দৃঢ়তার সাথে বলছি অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করতেই হবে। অযোধ্যা হিন্দুদের তীর্থস্থান। দেশদ্রোহী মুসলমানদের কাছ থেকে তো বটেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা কোন ন্যায়ালয়ের কাছ থেকেও এর স্বীকৃতি নেওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এদেশ হিন্দুদের। আমাদের তীর্থক্ষেত্র আমরা রক্ষা করব। সে বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আমরাই নেবো। মুসলমানদের স্বীকৃতি বা প্রমাণপত্রের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের দিবাস্বপ্ন সময় এলেই ঘুচিয়ে দেবো। বন্দুক ও রক্তপাতের ধম্‌কি কংগ্রেসী ষন্ডদের দেখাক। রক্ত আমাদের শরীরেও আছে আর রক্তের জোরও। ধর্মযুদ্ধ হলে তার প্রমাণ পাবে। তবে ওদের মত তুচ্ছ জীব মারতে তার অপব্যয় করা কেন? এদেশে থাকতে হলে নিজেদের যোগ্যতা বুঝে কথা বলুক।

রামমন্দিরের বিষয় নিয়ে বর্তমানে লোকসভায় ও অন্যত্র যে হৈ চৈ চলছে তা কত দুর ন্যায় সঙ্গত, সে আলোচনায় আমি আসতে চাইছিনা। কয়েকদিন আগে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ শ্রী ব্যাংকটচালাইয়া এক আদেশ জারী করেছেন। ন্যায়াধীশ, বিতর্কিত রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের কাজ স্থগিতের আদেশ দিতে অস্বীকার

করলেন ; কিন্তু সাথে সাথে এও আদেশ দিলেন যে ঐ জায়গায় কোন রকম স্থায়ী, পাক্কা নির্মাণ কার্য্য করা হলে ন্যায়ালয় তা ভেঙ্গে ফেলবে আর নির্মাণকারী বা কারীদের ন্যায়ালয় অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে! মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য চালু থাকবে কিন্তু স্থায়ী নির্মাণ কার্য্য করা যাবে না, এর মানে কি? আমার মাথায়তো ঢুকছে না, আইন বিশারদদের মাথায় ঢুকছে কি? ন্যায়ালয়ের অপমান করার ইচ্ছা আমার নেই, ন্যায়ালয়ের আদেশও মানতে রাজী আছি ; কিন্তু তার চেয়ে গণ আদেশের মূল্য অনেক বেশী। আর, "প্রভু রামচন্দ্র" ন্যায়ালয়ের অধিকারের সীমার বাইরে। ন্যায়ালয়েরও সীমা আছে। ন্যায়ালয়ের উচিৎ কোটি কোটি হিন্দুর ধর্ম্মানুভূতি যাতে জড়িত এমন প্রশ্ন থেকে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখা। মুসলমানরা অবুঝের মত ব্যবহার করলে তাদের কুকর্মের ফল তাদের ভুগতেই হবে। হিন্দুস্থানে হাজারো মসজিদ আছে, কিন্তু "রাম জন্মস্থান" একটাই। মুসলমানরা বলছে 'প্রমাণ কি?' তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনাহূত অতিথি, সেই রকমই থাকবে ; না হয় এদেশ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বো। শহাবুদ্দীন আর ইমামের দাড়ি চুলকাবে কংগ্রেসের নেতারা—ভোটের লোভে। আমি না। আমি ওদের ধমকিকে ভয়ও করি না, তোয়াক্কাও করি না। হিন্দুস্থানের কোটি কোটি হিন্দুর স্বার্থই আমার স্বার্থ। আর সেই স্বার্থ রক্ষার্থে সব কিছু বিসর্জন দিতে আমি প্রস্তুত।

বেশ কিছুদিন আগে পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবের কেশ একবার খোয়া গিয়েছিল। মুসলমানরা রাস্তায় নামলো। সম্পূর্ণ দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। হিন্দুস্থানের সম্পূর্ণ পুলিশ দল ও গোয়েন্দা বাহিনী কাজে লাগানো হল। শেষ পর্যন্ত কেশ পাওয়া গেল। কিন্তু যে কেশ পাওয়া গেল বলে ঘোষণা করা হল সেই কেশ হজরত মহম্মদের ছিল কি? এ প্রশ্নের জবাবে মুসলমানরা বলল—"এ আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যাপার।" আমরাও তো আজ একই কথা বলছি। ভগবান রাম ও তাঁরা জন্মস্থান এ আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। কাজেই বাবরি মসজিদ সেখানে ছিল কিনা তা খুঁজে দেখবার প্রয়োজন কি? অযোধ্যা হচ্ছে প্রভু রামচন্দ্রের জন্মস্থান। অযোধ্যার সাথে বাবরের সম্পর্ক কি? বাবর আক্রমণ করে সেখানে একটা (Structure) তৈরী করল আর তাতে লিখল—"এই জায়গা দেবদূত-এর বাসস্থান" আর সেই বিতর্কিত জায়গাকে মুসলমানরা, "বাবরি মসজিদ" এই নামে ডাকতে শুরু করল! কাল যদি ওরা হিন্দুস্থানকে পাকিস্তান বলে ডাকে তাহলে তা আমরা মেনে নেবো কি? কংগ্রেসীরা মাথা নীচু করে মেনে নেবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোটি কোটি হিন্দুদের। অযোধ্যার বিষয় নিয়ে পাকিস্তানের দালালরা যে জঘন্যতা শুরু করেছে তা মুখ বুঁজে কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের সামনে যেভাবে নতজানু হচ্ছে তাও একেবারে অসহ্য। একটা মন্দিরের জন্য হিন্দুস্থানে, হিন্দুদের স্থানে হাজারো হিন্দুর প্রাণ বলিদান করতে হয়। অযোধ্যার সরযু নদী শ্রী রামভক্ত হিন্দুর রক্তে এর আগেও লাল হয়েছে। প্রাণাহুতি দেওয়া সেই সব শহীদদের শোকতপ্ত আত্মার চীৎকার "মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে",

অযোধ্যার ও সরযু নদীর আকাশে বাতাসে আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রভু রামচন্দ্রের মন্দিরের জন্য হিন্দুদের রক্ত দিতে হল এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? আজও হিন্দুস্থানে দেব-দেবতার শক্তি আছে, দেব-দেবতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। তাই মন্দির নির্মাণ অবশ্যম্ভাবী। আর যে সত্যিকারের হিন্দু? যার ধমনীতে হিন্দু মাতা পিতার শুদ্ধ হিন্দু রক্ত বইছে, সেই সত্যিকারের হিন্দু—সেই হিন্দুস্থানী, রামমন্দির নির্মাণের বিরোধ করবে না। শহাবুদ্দীন ও ইমাম কে? ওদের যোগ্যতাই বা কতটুকু? ওদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে দেখে নেবো। হিন্দুরা বাবরকেও পরাজিত করেছে এরা তো চুনো পুঁটি।

"সামনা"—সতেরোই জুলাই ১৯৯২

সরযু আবার লাল হবে

এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় এক আদেশজারী করে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে! কলমের এক খোঁচায় যা খুশী সিদ্ধান্ত, সংখ্যাগুরু জনতার উপর চাপানো হবে আর তা শান্তভাবে চুপচাপ মেনে নিতে হবে এ কেমন ন্যায়? এমন বিচার আর এমন গণতন্ত্র আমি মানতে রাজী নই। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেওয়ার এই হচ্ছে প্রকৃত সময়। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করার জন্য হিন্দুস্থানে যে প্রতিকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে এর পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তি রয়েছে। হিন্দুস্থান সরকার ইসলাম সাম্রাজ্যের কাছে নতজানু হলেও আর কংগ্রেসের নেতারা মুসলমানদের ভোটের লোভে তাদের দাড়ি চুলকালেও এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত সাহস ও বল দেশের নাগরিকদের আজও আছে। ন্যায়ালয়গুলি অযোধ্যা বিষয় নিয়ে যে জট পাকিয়েছে এবং পাকাচ্ছে তা সত্যিই হাস্যকর! অযোধ্যায় নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখার দাবী জানিয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ শ্রী ব্যাংকটচালাইয়া, রবিবার তাঁর নিজের বাসস্থানে আয়োজিত বিশেষ শুনানিতে তা নাকচ করে দিয়েছেন কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের অন্য বেঞ্চ যাতে ছিলেন ন্যায়াধীশ রঝা, ন্যায়াধীশ মাথুর ও ন্যায়াধীশ বৃজেশ কুমার তাদের সামনে নির্মাণ কাজ স্থগিত করার আরেক আবেদন দাখিল করা হলে সেখানে ন্যায়াধীশরাও হিন্দু ও মুসলমান এই দুইভাগে বিভক্ত হলেন। ন্যায়াধীশ মাথুর ও ন্যায়াধীশ ব্রিজেশ কুমার আবেদন নাকচ করে দিলেন। কিন্তু ন্যায়াধীশ রঝা আলাদা চব্বিশ পৃষ্ঠা রায় দিয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত করার সুপারিশ করলেন। ন্যায়াসনে বসেও নিজধর্ম আঁকড়ে রইলো। রঝা বাবরির পক্ষ নিল!

কাল, ন্যায়ালয় আবার এক তাল-গোল পাকালো। একদিকে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় এক আদেশজারী করে রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ কাজ বন্ধ করল; আবার আর একদিকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় উত্তর প্রদেশ সরকারকে আদেশ দিল "অযোধ্যার বিতর্কিত জায়গায় যে নির্মাণ কাজ চলছে তার সবিস্তার হলফনামা ন্যায়ালয়ে দাখিল কর।" প্রত্যেক ন্যায়ালয় আলাদা আলাদা রায় দিচ্ছে আর আমরা তাই-ই স্বীকার করছি! আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি, আজ আবার স্পষ্টভাবে বলছি—রাম মন্দিরের বিষয়, কোন ন্যায়ালয়ের বিচার্য্য বিষয় না, এই বিষয় হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোটি কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধর্ম্মীয় ভাবনার বিষয়। ন্যায়ালয়ের উচিৎ হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করে, নিজেকে এই সমস্ত প্রশ্নের উর্দ্ধে রাখা। ন্যায়ালয়ের রায়েও যখন

সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম্মীয় রং লাগতে শুরু করেছে তখন ন্যায়ালয় এবং তাঁর রায়ের সম্মান কি করে রক্ষা করা যাবে? দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে আইন কানুনের পরিষ্কার কোন ব্যাখ্যা আজ আর নেই। আজ আইনও অসহায় এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! হিন্দুস্থানে আইন কানুন বলে আজ আর কিছু নেই। আইন কানুনের অস্তিত্ব যদি থাকতো তাহলে কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে মৃতদেহের পাহাড় জমতো না। যে রক্তনদী বইছে তা বইতো না। আইন কানুন এই ভাবে কলঙ্কিত হত না। সরকার কি করছে? শুধুই হিন্দুদের জ্ঞানামৃত পান করাচ্ছে। এদেশে আইন কানুন কোথায় আছে? যার হাতে শক্তি আছে, যার হাতে বন্দুক আছে—তার কথাই আইন, তার আদেশই কানুন। রাষ্ট্র কর্তারাই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসের নেতারা অযোধ্যায় যায় কিন্তু মন্দিরে গিয়ে শ্রী রামের দর্শন করে না। অথচ মসজিদে গিয়ে চাদর বিছায়। মন্দিরে গেলে তাদের 'সেক্যুলারপনা' বিঘ্নিত হবে। আর মসজিদে গেলে হবে মজবুত। এখনও সময় আছে; ন্যায়ালয় এই বিবাদ থেকে সরে যাক। বিবাদসৃষ্টি করেছে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা; তাদেরই স্বার্থে। একথা ভুলবার নয় যে মুসলমানদের ইচ্ছাকে পুষ্ট করার জন্যই দেশ বিভাজন করা হয়েছিল—যা ছিল এক বিরাট ক্ষমার অযোগ্য ভুল। চল্লিশ লাখ লোক প্রাণ হারালো। হাজারো স্ত্রীলোক বলাৎকারের শিকার হল—এর জন্য দায়ী কে? মোহনদাস গান্ধী বলতেন "আমি জীবিত থাকতে দেশ বিভাজন নয়।" নেহেরু বলতেন—"Pakistan is a fantastic nonsensey"। তবুও দেশ বিভাজন হল! কেন?—মুসলমানদের দাবীতে, মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য। হিন্দুস্থানের সংবিধান রচনা করা হয়েছে তাতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে "সংখ্যা গরিষ্ঠদের ইচ্ছার সম্মান এদেশের সংখ্যালঘুদের করতে হবে।" তাহলে আজ যখন এদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু চীৎকার করে বলছে "রাম-জন্মভূমি আমাদের, আমরা সেখানে মন্দির বাঁধবো।" তাতে বাধা কেন? কেন সম্মান জানানো হচ্ছে না তাদের ইচ্ছার?

কেন্দ্রীয় সরকার ও মুসলমান নেতারা এই সমস্যার সমাধান চায় না। তারা আরও জট পাকাতে চায়। ন্যায়ালয়, গর্ভগৃহে শ্রী রামের পূজা-অর্চনা করার অধিকার দিয়েছে। এখন লড়াই, মন্দির নির্মাণের। ন্যায়ালয়ের রায়ের প্রতীক্ষা আর কতদিন? অনেক হয়েছে। ১৯৪৯ সালের মোকদ্দমা আজ ১৯৯২ তেও শেষ হচ্ছে না। তবুও হিন্দুরা শান্ত আছে। হিন্দু কোনদিন ঝগড়া শুরু করে না, ইতিহাস তার সাক্ষী। ওদের তাজিয়ায়, মহরমের মিছিলে আমরা সহভাগী হই—কিন্তু তবুও হিন্দুদের শোভাযাত্রার উপর মুসলিম মহল্লা থেকে আক্রমণ চলছেই—তা কোনদিন থামছে না। শুধু আলিগড়, মুরাদাবাদ নয় যেখানে যেখানে ওদের সংখ্যা পঁচিশ শতাংশের বেশী সেখানেই এই ঘটনা ঘটছে। অযোধ্যায় মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচশতাংশ, সেখানে কোন ঝগড়া নেই। সংখ্যায় বেশী হলেই ওদের মাথায় পোকা ঢোকে। এদেশে থাকবে, এদেশের খাবে আর ইরান, ইরাকের স্বপ্ন দেখবে। পাকিস্তানের গুণ গাইবে—এই হচ্ছে ওদের দেশপ্রেম।

আমরা রাম-জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ করছি কোন মুসলমান বাস্তুতে নয়, তাতেও ওরা বাধা দিচ্ছে, আর আমাদের সরকার ওদের জামাই আদর করছে ; এ অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পরিশেষে আমি এইটুকুই বলছি—শ্রীরাম, হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা। রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ—এই বিষয় কোটি কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ঐতিহ্যের বিষয়। এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করে হিন্দুদের রক্তে সয়যু নদী লাল হয়েছে। সরযু নদী আবার লাল হবে—সরযু নদীতে আবার রক্ত বইবে। তবে এবারে সে রক্ত কিন্তু হিন্দুর রক্ত হবে না। সেটা যেন ভালো করে খেয়াল থাকে। আজ এইটুকুই যথেষ্ট।

সাবধান।

"সামনা"—আঠাশে জুলাই ১৯৯২

হিন্দুদেরও পার্শোনাল ল্য

অযোধ্যায় করসেবা বন্ধ হয়েছে। তার সাথে সাথে সংসদের দুই সভার চেঁচামেচিও শুনলাম। প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্মগুরুদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয়েছে। আপোষ মীমাংসাই যদি করা হবে তাহলে সংসদে ও সারাদেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল, এর জবাব জনতাকে কে দেবে? আর প্রধানমন্ত্রী যে তিনমাসের সময় চেয়ে নিয়েছে তা থেকে এমন কি সুরাহা হবে? রাম মন্দিরের লড়াই, কোটি কোটি হিন্দুর ধর্মীয় ঐতিহ্যের লড়াই। হিন্দুস্থানে, হিন্দুদের নিজেদের দেশে হিন্দুদেবতার মন্দিরের জন্য যে লড়াই করতে হচ্ছে, যে রক্ত দান করতে হচ্ছে ইতিহাসে এমন ঘটনার কোন নজীর নেই। তাই রাম মন্দিরের লড়াই হচ্ছে, হিন্দুস্থানের কোটি কোটি হিন্দুর দুঃখ গাঁথা। দুনিয়ায় কত মসজিদের উপর বুলডোজার চালানো হয়েছে, আরবরা ও মুসলমানরাই তাদের মসজিদ ভেঙেছে তার উদাহরণও আছে। কিন্তু বাবর নামক কোন এক বিদেশী আক্রমণকারী হিন্দুস্থানে এসে হিন্দুস্থানের হিন্দুদের দেবতার মন্দির ধ্বংস করল আর আজ সেই বাবরের কবরের জন্য হিন্দুস্থানের মুসলমানরা হিন্দুস্থান সরকারকে ধম্‌কি দিচ্ছে—এ কিসের লক্ষণ? এ বিষয়ে আমি অনেক লিখেছি আমার ভূমিকা ও আমার মত অনেকবার স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। মুসলমান ও তাদের ভর্ত্তা কংগ্রেসীদের এখন্ ন্যায়ালয়ের উপর দরদ জেগেছে! তারা প্রশ্ন করছে ন্যায় মন্দির ভেঙে রাম মন্দির নির্মাণ করা উচিৎ কি? কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ন্যায় মন্দিরের কবর কারা খুঁড়েছে তাহলে? একটু অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে ন্যায় মন্দিরের এক একটা ইঁট কলুষিত ও ভ্রষ্ট, এই নালায়েক কংগ্রেসীরাই করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মগুরুদের মধ্যে কি আপোষ মীমাংসা হয়েছে তার গভীরে যাওয়ার আমার প্রয়োজন নেই। তবে একথা বলতেই হচ্ছে যে আপোষ-মীমাংসা এমন দুজনের মধ্যে হওয়া সম্ভব যাদের নীতির মধ্যে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণ সামঞ্জস্য থাকে। মুসলমান নেতাদের কোন নীতি ধর্ম্ম বলে কিছু নেই, ওদের নিষ্ঠা লাহোর ও করাচীর উপর। ওদের মনোবৃত্তি বিকৃত। তাই ওদের সাথে আপোষ মীমাংসা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া রাম মন্দির সমস্যার সমাধান করার রাস্তা একটাই, তা হচ্ছে বিনা সর্ত্তে রাম-জন্মভূমিতে রাম মন্দির নির্মাণ করতে দেওয়া। তিন মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কি যাদুর কাঠি ঘোরাবে? আসলে এ হচ্ছে সময় অতিবাহিত করার এক ছলনামাত্র। আমি বুঝতে পারছিনা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা এ ফাঁদে পা দিলেন কেন? ......

করসেবা থামার সাথে সাথে শহাবুদ্দীন আবার বিষোদ্‌গার শুরু করেছে! "সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আদেশ দিলে আমরা বাবরি হিন্দুদের কাছে সঁপে দেবো।" কে এই শহাবুদ্দীন?

ওর যোগ্যতা কি? বাবরি কি ওর পৈতৃক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আসলে ঐ অধুনা বিতর্কিত জায়গায় বাবরি মসজিদ ছিল—এ এক অসত্য ঘটনা। ওখানে ছিল মন্দির। সেই মন্দির, ভেঙে মসজিদ বানানো হয়েছে। মুসলমানদের শরিয়তেও লেখা আছে—এক প্রার্থনাস্থান ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরী করলে সেই মসজিদে নামাজ আদা করলে খোদা সেই নামাজ স্বীকার করেন না। সে বিচার মুসলমানদের করা উচিৎ নয় কি? আসলে সাধারণ মুসলমান, মন্দির নির্মাণের বিরোধী নয়। তাদের নেতারা সম্পূর্ণ সমাজকে বিপথে নিয়ে চলছে, তাদের ঠকাচ্ছে!

মুসলমান নেতাদের এখন ন্যায়ালয়ের উপর প্রেম উথ্‌লে উঠছে, এখন ওদের ন্যায়ালয়ের মহত্ব মনে পড়ল। এ হচ্ছে সাপের মুখ থেকে বিষের বদলে অমৃত বেরোবার মত অলীক ঘটনা। শাহাবানুর ঘটনায় এই মুসলমান নেতারা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানে যে 'উলঙ্গ নৃত্য' করল এদেশের মানুষ এখনও তা ভোলেনি। ইন্দোরের এক সাধারণ মহিলা শাহাবানু তাকে তার স্বামী তালাক্‌ দিয়েছে। শাহাবানু ন্যায়ালয়ে ভরণ পোষণের মোকদ্দমা দাখিল করলে ন্যায়ালয় তার স্বামীকে ভরণপোষণ দেওয়ার আদেশ দেন। ন্যায়ালয়ের সেই আদেশের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত মুসলমান তাদের নেতাদের প্ররোচনায় রাস্তায় নামল। ন্যায়ালয়ের আদেশ পদদলিত করল, দেশের সংবিধান পোড়ালো। মুসলমান নেতারা ঘোষণা করল "আমাদের মুসলিম পার্শোনাল ল্য এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ন্যায়ালয়ের নেই"। আর কংগ্রেসীরা ওদের সমর্থন করল। ন্যায়ালয়ের আদেশ অমান্য করে শরিয়তের বিজয় হল। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মুসলমানদের দাড়ি চুলকোবার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করল। কোথাকার কে এক শাহাবানু তার জন্য হিন্দুস্থানের ন্যায় মন্দিরের অপমান, যে মুসলমান নেতারা করল তাদের এখন ন্যায়ালয়ের উপর প্রেম উথলে পড়ছে। শাহাবানু ঘটনায় মুসলমানরা যে ভূমিকা নিয়েছিল, হিন্দুদের উচিৎ এখন সেই ভূমিকা নেওয়া। আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবতার ব্যাপারে মুসলমান ও ন্যায়ালয়ের কোন হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করব না; কারণ আমাদের দেব-দেবতা ও আমাদের ধর্ম এ বিষয়ে আমাদের হিন্দুদের এক পার্শোনাল ল্য আছে তাতে হস্তক্ষেপ করলে আমরাও দেখে নেবো। হিন্দুদের 'পার্শোনাল ল্য' তে যারা হস্তক্ষেপ করবে তারা কবরে যাবে। 'হে-রাম' বলে অন্তিম শয্যায় শয়ন করবে।

১

পুনরায় একবার ভারত ছাড়ো

পঞ্চাশ বছর আগে মহাত্মা গান্ধী মুম্বইয়ের গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক ময়দানে 'ভারত ছাড়ো' ঘোষণা দিলেন। এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ দেশ উত্তেজনায় ছেয়ে গেল। দেশের পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল গম্ভীর। তরুণ বিপ্লবীদের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। সাধারণ মানুষও তৈরী ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বলি দিতে। যে করেই হোক স্বাধীনতা চাই। ঠিক এই সময়েই গান্ধীর ঘোষণা, স্বাধীনতা আন্দোলনের যজ্ঞে ঘৃতাহুতির মত কাজ করল। ইংরেজ সরকারের দমন কার্য্যের তান্ডব নৃত্য দেশ জুড়ে শুরু হল। চারিদিকে কাঁদুনে গ্যাস গুলি গোলা চলতে থাকলো, সমস্ত জেলগুলি ভরে গেল। নেতাদেরও আটক করা হল। কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষ নিরাশ হল না। নেতা ছাড়াই আন্দোলন চলতে থাকলো। বালিয়া জেলায় বিদ্রোহ হল। কোটায় পুলিশ থানার মধ্যে ইংরেজ অধিকারীদের আটকে রেখে 'ভারত ছাড়ো' ঘোষণা দেওয়া হল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শেষ অধ্যায় শুরু হল ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্ট মধ্যরাত্রি থেকে। আজ তার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আমরা পালন করছি। 'ভারত ছাড়ো' শব্দের সেই শক্তি ১৯৪২ এর সংগ্রামের সময় আমি দেখেছি, গান্ধীজী ও তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে আমি বিশ্বাসী না হলেও, তাঁর সাথে প্রচুর রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁর অমূল্য ভূমিকা কোন অবস্থাতেই ভোলা যায় না আর অমি তা আন্তরিকভাবে স্বীকার করছি এবং সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা প্রাণাহুতি দিয়েছেন সেই বিপ্লবীদের বিনম্র অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'ভারত ছাড়ো' এ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্বে এক মহামন্ত্রে পরিণত হল। সম্পূর্ণ দেশ যখন বিদ্রোহ করে ওঠে তখন সে সংগ্রাম থামানো কারোর পক্ষে সম্ভব হয় না ; ১৯৪২ এর এই আন্দোলন তা প্রমাণ করল। আজ সেই অবিস্মরণীয় আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করতে গিয়ে অনেক চিন্তা, অনেক প্রশ্ন মনে জাগছে। 'ভারত ছাড়ো' শব্দের অর্থ শুধু ইংরেজরা দেশ ছাড়ুক এই ছিল কি? শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই লড়াই ছিল না, দেশের এক বিশেষ অংশ ইংরেজ সংস্কৃতির গোলাম হয়ে পড়েছিল, এ লড়াই তাদের বিরুদ্ধে ছিল। সমাজের পরিবর্তন ; এও ছিল এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য। লড়াইয়ের প্রত্যেক সৈনিক ছিল এক একজন সেনাপতি। তাই দেশে এক আত্মবিশ্বাসের এবং আত্মনির্ভরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। সংকল্প ও বিকাশের নতুন মার্গ তৈরী হল। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর পর সেই সব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। রাস্তাও হয়েছে অনিশ্চিত এবং সন্দেহপূর্ণ আমরা শুধু স্বাধীনতাই পেয়েছি কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়েছি অসমর্থ। ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্ট গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক ময়দানে যে সংকল্প নেওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ বছরে তাও ধূলায় মিলিয়ে গেছে। স্বাধীনতা

প্রাপ্তির লড়াই আমরা জিতেছি কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে আমরা হয়েছি পরাভূত। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু আমাদের আদর্শ, আমাদের স্বপ্ন তার কি হল? কোথায় সেই স্বাধীন ভারত যা আমরা চেয়েছিলাম? স্বাধীনতা পেলো মুষ্টিমেয় লোক ; স্বাধীনতা যাদের উদ্দেশ্য ছিলনা ছিল মাধ্যম। সেই মাধ্যম অবলম্বন করে এই দেশ মুঠিতে আনা, অধিকার গ্রহণ করা, এই ছিল যাদের উদ্দেশ্য ; তারাই দেশটাকে ভাগ করে নিল, নিজেদের স্বার্থের জন্য ভাষা, জাতি, ধর্মের ভিত্তিতে দেশটাকে টুকরো টুকরো করল। একটা দেশকে কতগুলি ছোট ছোট দেশে পরিণত করল। গান্ধীজী দেশটাকে দুই টুকরো করলেন। এক টুকরো মুসলমানদের ঝুলিতে দিলেন আর বাকিটা গান্ধীর শিষ্যরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিল। "আমরা ভারতীয়" এই পরিচয় কারো রইল না। হিন্দু, শিখ, মুসলমান, বৌদ্ধ এই পরিচয়ে আমরা পরিচিত হলাম, কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারী আর রাজস্থান থেকে আসাম পর্য্যন্ত এই দেশ অভিন্ন, আমরা কখনই দেখতে পেলাম না। আমরা দেখছি আজাদ কাশ্মীর, খলিস্তান, বোড়োল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড এই রকম ভয়ংকর ব্যাধিতে জর্জরিত এই দেশ। স্বাধীনতার সূর্যোদয় হল। কিন্তু অন্ধকার ঘুচলো না, বিকাশের সূর্যোদয় হল না। 'আতঙ্ক বাদ' হল আমাদের হাতিয়ার, বিচ্ছিন্নতাবাদ চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু কেন? স্বাধীন হিন্দুস্থানের এই রাজ্যগুলি কেন চাইছে হিন্দুস্থান থেকে বিভক্ত হতে? আর তার জন্য কত নিরপরাধ নাগরিকের রক্তে ভিজবে দেশের মাটি? কত হত্যাকান্ড হবে? দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হল। অরুণ বৈদ্যর মত সেনাধিকারী-কে বিনা কারণে খুন করা হল। কত সংসার বিধ্বস্ত হল, কত নিরাপরাধী প্রাণ হারালো ; আর আমরা বসে বসে শুধু তার সংখ্যা গুনছি। সন্ত্রাসবাদীরা যখন নিরাপরাধ মানুষদের হত্যা করে, দেখে আমাদের মনে অসহ্য বেদনা হওয়া উচিৎ কিন্তু আজ তা হয় না। আমাদের মনে আঁচড়ও লাগে না—আমরা আজ এত পাষাণ হয়ে গেছি, কেন? কিসের নেশায়? এ নেশা অজ্ঞান ও অবিবেকের নেশা। এথেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। তবেই আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পারবো। 'ভারত ছাড়ো' শব্দের অর্থ শুধু ইংরেজ চলে যাও এই নয় সেই আন্দোলন ১৯৪২ সালেই শেষ হয়নি সেই আন্দোলনের মশাল আজও জ্বালিয়ে রাখতে হবে তার দায়িত্ব আমাদের সবার। 'ভারত ছাড়ো' এর অর্থ আমাদের আবার একবার বুঝতে হবে।

আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নিজেদের সম্পূর্ণ উৎসর্গ করল সেই মহান ব্যক্তিদের নাম ভাঙিয়ে আজ সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। নেতা ও রাষ্টকর্তাদের বুদ্ধি কবেই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ক্রান্তীকারীদের চিহ্ন 'গান্ধী টোপী' আজ ভ্রষ্টাচার ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেতারা বিবেক ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিবেশী দুই দিন না খেয়ে থাকলে আমাদের মনে কষ্ট হয় না। নিজেদের শরীরে নিখুঁত ইস্ত্রি করা শুভ্র খাদীর পোষাক চাই কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের পরণে ছেঁড়া কাপড়ও নেই সে জন্য আমাদের লজ্জা হয় না। আমি মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বজ্ঞান শোনাচ্ছি না, তবে গান্ধীর জন্য

যে আজ দেশের এই পরিস্থিতি একথা মনে পড়লেই মন বেদনায় ভরে ওঠে। চারিদিকে শুধু স্বার্থ আর ভ্রষ্টাচার। স্বার্থে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি। যে "ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাকে সম্পূর্ণ দেশ জেগে উঠলো, এই কি সেই দেশ? রাষ্ট্রীয়ত্ব মানে কি? দেশাভিমান কাকে বলে? আমরা কারা? আমাদের ধর্ম কি? এসব যখন আজ আমরা ভুলতে বসেছি তখন" আগষ্ট ক্রান্তি ময়দানে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে কি লাভ? গত পঞ্চাশ বছরে আমরা সব কিছু খুইয়েছি। এর জন্য কে দায়ী সে আলোচনা আজ আমি করছি না। কিন্তু একথা তো লিখতেই হচ্ছে যে আজ দেশে সর্বনাশের মূলে যারা, তারা অনেকেই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারা সবাই যে দেশের শাসন ব্যবস্থা চালাবার উপযুক্ত পাত্র হবে তার কোন মানে নেই। তার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন পরে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে অধিকারে এসেছেন সত্য কিন্তু তারা সফল হন নি। আবার এমন অনেকও ছিলেন অধিকারে আসবার জন্যই যারা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অতীতের অনেক ঘটনা তার সাক্ষী। তারাও ও তাদের বংশধররাই এই দেশের সর্বনাশ করছে। এরাই হিন্দুস্থানকে দুনিয়ার সামনে ভ্রষ্টাচারীদের দেশ নামে কলঙ্কিত করছে। বোফোর্স কামান যা দেশের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে, সেই চুক্তির জন্যও এরা দালালি খেলো, এখন আবার ব্যাংকও লুটছে? কি বাকি রেখেছে? কোথায় খাচ্ছে না এরা? এই দেশ, দেশের মানুষের স্বার্থের কথা ভাবছে না তাদের কাছে আর কি আশা করা যায়? মন্দির মসজিদের বিবাদ শুরু হল। নেতারা মসজিদের পক্ষে গেলো, মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য বন্ধ করল, এ ঘটল আমাদের নিজেদের দেশে, হিন্দুস্থানে। এর আগে শাহাবানুর ঘটনায় মুসলমান নেতারা সরকারকে হুম্‌কি দিল আর কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য দেশে সংবিধান পরিবর্তিত হল। যাদের জন্য এই দেশের বিভাজন হল, যারা দেশে ধর্মান্ধতার বিষ ছড়ালো, দেশের সংবিধান প্রকাশ্যে অগ্নিদাহ করল। স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও আমরা যাদের জন্য শান্তিতে থাকতে পারছিনা সেই মুসলমানদের আজ এদেশে জামাই আদর করা হচ্ছে। এই দেশ আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে জর্জরিত। আমরা এখানে শ্রীরামের মন্দির নির্মাণ করতে পারি না। আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, নিবাস নাই, আমাদের রোজগার নাই, এ কেমন স্বাধীনতা?

১৯৪২ এর ক্রান্তিকারী মহামন্ত্র "ভারত ছাড়ো" শ্লোগান আবার একবার জোরদার করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষকে আবার সচেতন হতে হবে। তপ্ত হতে হবে। আগুনের মত লেলিহান হতে হবে। কোটি কোটি কণ্ঠে সোচ্চারে আবার উদ্‌ঘোষ দিতে হবে—"ভারত ছাড়ো"—দেশদ্রোহী মুসলমানরা ভারত ছাড়ো হিন্দুস্থানের খন্ড-বিখন্ডকারীরা ভারত ছাড়ো—বেইমান নেতারা ভারত ছাড়ো—ভারত ছাড়ো—আবার একবার ভারত ছাড়ো।

উদ্‌ঘোষ আগের মত সংঘবদ্ধ ভাবে, জোরালো ভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলে তবেই এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে—না হয় যেভাবে আছি সাতজন্ম এইভাবেই থাকতে হবে।

সাবধান !!

করলে তারা সেই নামই বলবে যা তাদের মা তাদেরকে বলেছেন, কারণ এ হচ্ছে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়েই লাখো করসেবক বার বার অযোধ্যায় জমা হয় আর নির্মাণ কার্য্য শুরু করার পূর্বেই ন্যায়ালয়ের এক একটা বিচিত্র আদেশ এসে তাদের স্বপ্ন ধূলিতে মিলিয়ে দেয়! এ আর কতদিন সহ্য করা হবে? আলোচনা ও আপোষ মীমাংসায় এ সমস্যার সমাধান হবে না কারণ আপোষ এই শব্দ মুসলমানদের রক্তে নেই।

হিন্দুস্থানে প্রায় তিন হাজার মসজিদ তৈরী হয়েছে মন্দির ধ্বংস করে। তার মধ্যে হিন্দুরা দাবী করছে মাত্র অযোধ্যা, মথুরা ও কাশী। এর মধ্যে মথুরা ও কাশীর মন্দির ঔরঙ্গজেব ভেঙ্গেছিল আর বাবর অযোধ্যা আক্রমণ করে মন্দিরের উপর তৈরী করল গোলাকার গম্বুজ। **এ মসজিদ নয় ; এ হচ্ছে বিদেশী আক্রমণের ও দাসত্বের বেদনা-দায়ক চিহ্ন। এই চিহ্ন মুছে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে অযোধ্যায়। অযোধ্যার লড়াই সমস্ত হিন্দুদের হিন্দু হয়ে বাঁচার লড়াই, হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার লড়াই, হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করার পবিত্র এবং মহান যজ্ঞ। এই পবিত্র এবং মহান যজ্ঞে তামাম শিবসৈনিক, তামাম হিন্দুর তন, মন, ধন অর্পণ করে সহভাগী হতে হবে।** বিশ্ব হিন্দু-পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পক্ষের অভিজ্ঞ অগ্রণী নেতাদের আমার অনুরোধ, অযোধ্যার রণভূমিতে হিন্দুত্বের যে আকাশ-ছোঁয়া শিখা জ্বলে উঠেছে, তা নিভতে দিও না—এই ভাবেই জ্বালিয়ে রাখো। আমি আমাদের সমস্ত শক্তিসহ এই রণভূমিতে নামছি। শিবসৈনিকদের অযোধ্যার দিকে প্রস্তুতি পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়ার আদেশ আমি দিয়েছি। শিবসৈনিকদের এই ঝটিকা বাহিনী অযোধ্যার রণভূমিতে গিয়ে পৌঁছালে মন্দির বিরোধীদের থরহরি কম্প শুরু হয়ে যাবে। শিবসৈনিক রণাঙ্গনে নামবে হাতে খোল, করতাল নিয়ে নয় ; খোল, করতাল নিয়ে ভজন কীর্ত্তন করার জন্য তাদের জন্ম হয়নি আর সেইভাবে আমি তাদের তৈরী করিনি। অযোধ্যায় শিবসৈনিকদের তাঁদের প্রাপ্য সম্মান জানানো হবে ; আমি রণনেতা শ্রী অশোক সিংহলের কাছ থেকে এই আশা করছি। এর আগে অযোধ্যার সব লড়াই শিবসৈনিক ছাড়াই লড়া হয়েছে। এবারে তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেখ—বিজয় সুনিশ্চিত। যে লড়াকু শিবসৈনিক অযোধ্যার দিকেএগিয়ে চলেছে তাদের শক্তি কেমন জানো?—সিংহের মত দুনিয়া কাঁপানো তাদের গর্জন—হাতীর মত গঠিত/উদ্ধত দম্ভপূর্ণ তাদের চলন। গন্ডারের মত শক্তিসম্পন্ন, —চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র। অযোধ্যার দিকে এগিয়ে চলা এই হিন্দুযোদ্ধাদের আমার অনেক অনেক শুভ আশীর্বাদ। বিজয়ী হয়ে অক্ষত শরীরে ফিরে আসার পথের দিকে তাকিয়ে চাতকের মত অপেক্ষা করছি।

জয় শ্রীরাম

সৎ—অসতের সংগ্রামে সৎ-এর জয় সম্ভব নয়; যদি তার পিছনে শক্তি না থাকে। সুদর্শন চক্র ব্যতীত অশোক চক্র সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিপদের সময় অশোক চক্র যদি সুদর্শন চক্রের ভূমিকা না নেয়, তা হলে ধুলোয় গড়াবে।

বীর সাবরকার

"সামনা"—আটই ডিসেম্বর ১৯৯২

দেশদ্রোহীদের খতম কর

সুনিশ্চিত বিজয় সন্নিকটে ; তবুও অযথা সময় নষ্ট করলে ইতিহাস কোনদিন আমাদের ক্ষমা করবে না। অযোধ্যার রাম জন্মভূমি করসেবকেরা দখল করেছে, বাবরি মসজিদ মাটির সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। একটুও সময় নষ্ট না করে সেখানে এখন প্রভু শ্রী রামের মন্দির নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক। সমস্ত নেতারা অযোধ্যার যুদ্ধক্ষেত্রে রণভঙ্গ দিলেও প্রভু শ্রী রামের বিজয় রথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হাজারো সাধু, সন্ত ও করসেবকদের। আর তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করবেই এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য কাল বিলম্ব করা ঠিক না। বাবরি মসজিদের যে গম্বুজ আমাদের সাহসী হিন্দু যোদ্ধারা বিধ্বস্ত করেছে সেখানে 'শ্রী রামের অর্থাৎ হিন্দুত্বের গৈরিক পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে'—এই দৃশ্য যখন দুনিয়ার মানুষ দেখবে তখনই—একমাত্র তখনই হিন্দু ও হিন্দুস্থান সবার সামনে আবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হিন্দুস্থানকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করবে। বিদেশী আক্রমণকারীদের অত্যাচারের সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে সেই জায়গায় স্বদেশের ঐতিহ্যবহনকারী "রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ" নির্মাণ করার এই প্রক্রিয়া লাগাতার চলতে থাকলে তবেই এই দেশের ও ধর্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। অযোধ্যার রণভূমির হিন্দু যোদ্ধাদের সাফল্যের কারণ হচ্ছে তাদের প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, অবদমিত উৎসাহ। রণভূমির সেই জ্ঞাত, অজ্ঞাত সমস্ত হিন্দু 'রণবীর'দের আমার শত সহস্র প্রণাম জানাচ্ছি। ইসলামী আক্রমণকারী বাবর বিজয়ী নয়। চারশো পঞ্চাশ বছর পরে হলেও হিন্দুরা যুদ্ধ করেই অযোধ্যার রাম জন্মভূমি আবার তাদের দখলে আনলো—তাই হিন্দুরাই বিজয়ী সাব্যস্ত হল। এ থেকেই মুসলমানরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করুক, আর বাবর প্রেমে বিভোর হয়ে তারা যে 'উলঙ্গ নৃত্য' শুরু করেছে তা থামাক—না হয় তাদের অবস্থাও বাবরি মসজিদের মতই হবে। বাবরি মসজিদের মতই তারাও ধূলায় মিলিয়ে যাবে। বাবরি মসজিদের গম্বুজ ভাঙার সাথে সাথে দেশদ্রোহী মুসলমানরা সম্পূর্ণ দেশে হিংসার তান্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আমি তাদের আর একবার শেষবারের মত সাবধান করে দিয়ে বলছি—এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রবাহে যোগ দাও—স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ শুরু করেছো, তা থামাও—খবরদার! পরিণাম ভালো হবে না—কোন অবস্থাতেই রেহাই পাবে না।

সরকার পরাভূত

বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর প্রদেশের "ভারতীয় জনতা পার্টির" সরকার বরখাস্ত করল। আবার ওদিকে লালকৃষ্ণ আডবানীও

বিরোধী দলনেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বাবরি মসজিদের লড়াই হিন্দুরা জিতলেও রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানরা বাবর প্রেমে বিভোর হয়ে সম্পূর্ণ দেশে যে হিংসাকান্ড শুরু করেছে তার মোকাবিলাও আমাদেরই করতে হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— "এই ঘটনা দুঃখজনক"। কিন্তু আসলে কয়েক কোটি হিন্দুর জন্য এ এক সুখকর ঘটনা, খুশীর দিন। ইমাম বুখারীর 'ভারত বন্ধ'-এর ডাক শহাবুদ্দীনের দেশদ্রোহী বক্তব্য, আর কেন্দ্রীয় সরকারের মুসলমানদের সামনে নতমস্তক হওয়া লক্ষ্য করার মত। মুসলমানরা 'কালা দিবস' পালন করল আর হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু করল। ওদের কাছে আছে অস্ত্র, আছে বন্দুক, ষ্টেনগান। কোথায় পেলো এসব? সরকার জানে না? শুধু মুম্বই-য়েই নয়, এই দেশের সমস্ত মসজিদগুলি আজ বেআইনী অস্ত্র ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করছি—কি করেছে আমাদের সরকার? এই নপুংসক সরকারের আসল চেহারা দেশদ্রোহী মুসলমানরা চেনে। ভোটের জন্য এই কংগ্রেসী নেতারা মুসলমানদের লুঙ্গিও ধুয়ে দেবে। এ হচ্ছে গত পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাস। মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় "মিনি পাকিস্তান" নামে পরিচিত মুসলিম মহল্লাগুলি বিধ্বস্ত 'বাবরি'র জন্য 'মাতম' (শোক পালন) করছে। যানবাহন প্রতিরোধ করছে। হিন্দুদের মন্দিরে আক্রমণ করছে। আমি সরকারকে বিশেষ করে পুলিশদের বলছি অনতিবিলম্বে এ সব প্রতিরোধ কর—না হয় এই বন্দুকের গুলি একদিন তোমাদের উপরও চল্‌বে। এরা মুসলমান বলে বলছিনা, এরা দেশদ্রোহী। এই দেশদ্রোহীরা আজ দেশের সর্বনাশ করতে চলেছে তাই বলছি। শাসনে অধিষ্ঠিত নেতাদের মধ্যে একজনও এই দেশদ্রোহীদের বিরোধ করছে না। নিন্দা করছেনা—হিন্দুস্থান ও হিন্দুধর্মের জন্য এ এক লজ্জাকর ব্যাপার। 'ইসলাম খত্‌রেমে' ঘোষণা দিয়ে সম্পূর্ণ দেশজুড়ে এরা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে। মুম্বই-এর ভেন্ডিবাজার থেকে দিল্লির জামা-মসজিদ পর্যন্ত সব জায়গা থেকেই বিষময় সাম্প্রদায়িক প্রচার চলেছে। কি করছে আমাদের সরকার, আর পুলিশ বাহিনী? আর আমি যখন দেশসেবামূলক কাজের জন্য হিন্দুদের একত্রিত হবার, সংগঠিত হওয়ার আহ্বান করলাম তখন আমার গায়ে 'ধর্মান্ধ'তার লেবেল লাগানো হল। যে শহাবুদ্দীন আর বুখারী ধম্‌কি দিচ্ছে 'মুসলিম ধর্মে যে সরকার হস্তক্ষেপ করবে সে সরকারকে আমরা টিঁকতে দেবো না' সেই শহাবুদ্দীন, সেই বুখারী সরকারের নজরে 'ধর্মান্ধ' বা জাত্যান্ধ নয়। ধর্মান্ধ আমি। জাত্যান্ধ আমি। ওদের ধম্‌কি মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে? এ কি রকম ন্যায়? কোন্ ন্যায়ালয় একে ন্যায় বলে মানবে? কোন্ সংবিধানে লেখা আছে? কেন আমরা এসব সহ্য করব? তাও আবার আমাদের নিজেদের দেশে—হিন্দুস্থানে! সরকার কাদের থাকবে, অধিকারে কে বসবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারও যদি মুসলমানদের হাতেই থাকে তাহলে আমাদের 'হিন্দু' পরিচয় নিয়ে বেঁচে কি লাভ? আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের গুণগান কোন মুখে— কোন অধিকারে করব? এদেশে দেশদ্রোহী মুসলমানদের বাঁচিয়ে হিন্দুদের সাথেই সব

সময় হীনতম আচরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে ! পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যারা হিন্দুস্থানে এই বিষ বপন করছিল সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ হল কাল অযোধ্যায় আর বিদেশী আক্রমণকারী মুসলমানদের বিজয়ী নিশান ধূলিতে মিলিয়ে গেলো। এই ঘটনা, কংগ্রেসের জন্য 'দুঃখকর' হলেও হিন্দুদের জন্য অত্যন্ত সুখকর। এই পরাভব মুসলমানদের নয়—এই পরাভব মুসলিম তুষ্টিকরণকারী কংগ্রেস সরকারের।

কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব হয়তো আনা হবে, কিন্তু তার আগেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা রাম জন্মভূমি দখল করে রাও সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থা জানিয়ে দিয়েছে। রাও সরকারকে 'গেট আউট' নোটিশ দিয়েছে। এই ঝড় থামবে না। থামানো যাবে না। যারা থামাবার চেষ্টা করবে তারা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হয়তো মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন হতে পারে ; তাহলে সরকার স্থাপিত হবে হিন্দুদের। দেশে হিন্দুধর্মের পতাকা নিজের অধিকারে—সহর্ষে উড়বে। বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের জন্য যাদের দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে তারা এদেশ থেকে পাত্‌তাড়ি গোটাক। আক্রমণকারী বাবরের জন্য যারা বুক চাপড়াচ্ছে এদেশ ওদের নয়—এদেশের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই—বসবাস করার অধিকারও না। যে সব মুসলমান হিংসাচার করছে, হিন্দুদের দেবীর মূর্ত্তি-মন্দির কলুষিত করছে, তারা দেশদ্রোহী। তাদের ধর্ম নেই, ঈশ্বর নেই, দেশ নেই, কোনও সংস্কৃতিও নেই। 'দেশদ্রোহী' এই তাদের একমাত্র পরিচয়। যে মাতৃভূমিতে তারা বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে, যে দেশের জল, বায়ু, অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আসছে—নিজেদের সেই মাতৃভূমির উপরই যদি তারা ব্যভিচার করতে পারে তাহলে তাদের যে করেই হোক, যে ভাবেই হোক নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। দেশের পরিস্থিতি আজ গম্ভীর। হিন্দুধর্মের সম্মান, হিন্দুযোদ্ধারা বাঁচিয়েছে—সরযূ নদীর তীরে, নিজেদের রক্তে সরযু নদী বারবার ভরিয়ে দিয়েও। মুসলমানরা এখন মন্দির আক্রমণ করে জ্বালা নেভাচ্ছে। তাদেরও ব্যবস্থা করতে হবে। বদলা নিতে হবে। হিন্দুদের উপর আজ যারা আক্রমণ করছে, মন্দির পোড়াচ্ছে, মূর্ত্তি নষ্ট করছে, তাদের জিজ্ঞেস করছি আশি কোটি হিন্দু যদি ঠিক একই ভাবে বদলা নেওয়ার সংকল্প নেয়, একই ভাবে প্রতিকার করে, আক্রমণ চালায় তা হলে ?

তাহলে, কি হবে, কি হতে পারে এ কথা বলার জন্য কোন জ্যোতিষের প্রয়োজন আছে কি ?

সাবধান !

"সামনা"—নয়ই জানুয়ারী ১৯৯৩

দেশ বাঁচাও

চৌদ্দজন নিরপরাধ নাগরিককে, দেশদ্রোহী ধর্মান্ধ মুসলমানরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারলো। দুধের শিশুরাও আগুনে দগ্ধ হল। কত পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হল, পুড়ে ছাই হল সব কিছু ; তবুও আমাদের সরকার ও নির্লজ্জ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উন্মত্ত শ্বাপদের দল রাস্তায় রাস্তায় যখন এই ভাবে রক্তগঙ্গা বইয়ে বেড়াচ্ছে তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও তার তৈরী "শান্তি কমিটির" কংগ্রেসী নেতারা মুসলমান বস্তিতে গিয়ে তাদের খোশামোদ করছে, তাদের পা চাটছে। দুঃখ, কষ্ট, বিপদ ও উপেক্ষার ঝড়ো হাওয়ায় সাধারণ মানুষ দিশাহীন। নিরপরাধ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে ছট্ ফট্ করছে, রক্ত গঙ্গায় হাবুডুবু খাচ্ছে। ভস্মীভূত ঘরের ভস্ম গায়ে মেখে সমস্ত হিন্দু রাস্তায় নামলে পরিণাম কি হবে? ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরা, পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য, বাৎসল্য সমাজ ব্যবস্থা—এই সবের বিধ্বস্তকারী দেশদ্রোহী মুসলমানরা পুলিশ ও মিলিটারীদের নাকের ডগায় দল বেঁধে যখন অত্যাচার চালাচ্ছে, আমরা চুপচাপ বসে দেখবো কি? সরকার মুসলমানদের সামনে নতজানু হলেও আমরা শান্তির কবুতর আকাশে ওড়াতে রাজী না। গতকালের নরসংহার দেখে বোঝা যাচ্ছে এই ভীষণ কান্ডের পূর্ব-পরিকল্পনা দেশদ্রোহীরা অনেক আগেই করে রেখেছিলো। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সময় থেকেই মালবার থেকে শুরু করে নোয়াখালি পর্যন্ত মুসলমানরা অধিকাধিক হিংসাপরায়ন হতে থাকলো আর হিন্দুরা হতে থাকলো আরো অহিংসক। মুসলমানদের সেই জঘন্য হিংস্ররূপ মুম্বই শহর কাল আবার দেখলো। নোয়াখালি ও কলকাতায় হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচার প্রতিহত করেছে শুনে গান্ধী বলেছিল "প্রতিহত না করে সব হিন্দু মৃত্যু বরণ করলে হিন্দু ও হিন্দুস্থান মুক্তি পেতো।" হিন্দুত্ববাদী সাংবাদিক বি. এন. যোগ লিখছেন—"গত একশ বছরের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে হিন্দুদের ও হিন্দুস্থানের সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থাই বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। রাষ্ট্র কর্তারা নিজেদের অধিকার পদ টিকিয়ে রাখবার জন্য মুসলমান তুষ্টিকরণ ও মুসলমানদের কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মান্ধতা যেভাবে সহ্য করেছে, উস্কানি দিয়েছে—ছয়ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস তারই পরিণতি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে হিন্দুদের পরিস্থিতি—অস্ত্র বিসর্জন দিয়ে নিজে মরার জন্য প্রস্তুত বিমূঢ় অর্জুনের মত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিভ্রান্তি কেটে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের বিভ্রান্তি দূর করেছিলেন তেমনি বর্তমান পরিস্থিতিই হিন্দুদের বিভ্রান্তি দূর করেছে। অতীতের ঝগড়া বর্তমানকালে টেনে এনে ভবিষ্যৎ কাল নষ্ট করা উচিৎ নয় এই জ্ঞানামৃত হিন্দুরা এতদিন পান করে এসেছে। কিন্তু অতীতের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি বর্তমান কালেও করে আমরা ভবিষ্যৎকাল আরও রক্ত-রঞ্জিত করব, এ কথা কেউ বললে তা শুনে নেওয়ার ও চুপচাপ সহ্য করার মত মানসিক

পরিস্থিতি হিন্দুদের আজ আর নেই। অতীতে যে ভুল করেছে বর্তমানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করে ভবিষ্যৎ অন্ধকার করার মত ভুল হিন্দুরা আর করবে না।" এই সরকার আর তাদের মূর্খ নেতারা বছরের পর বছর ধরে জাত্যান্ধ দেশদ্রোহী রাক্ষস পুষে আসছে। সেই দেশদ্রোহী ধর্মান্ধ রাক্ষস আজ সম্পূর্ণ দেশে হিংসার তান্ডবনৃত্য শুরু করেছে। সরকার তা থামাতে পারছে না—থামাচ্ছে না। হিন্দুরা রাষ্ট্রনিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ। আজ সেই রাষ্ট্রনিষ্ঠ হিন্দুর রক্তে এই শহরের মাটি লাল হচ্ছে। হে জন্মভূমি, হে উদাত্ত ভারত, যুগ যুগ ধরে বিধর্ম্মীর বিষাক্ত নখরাঘাতে জর্জরিত মাতৃভূমি আমার, লাখো হিন্দুবীরের এ রক্তস্রোত—তাদের জননীর বাধাহীন অশ্রুধারা, মহাকালের অনন্তকোলে হারিয়ে যেতে দিওনা। তোমার কোলে—তোমার মাটিতে মিশিয়ে নাও, জন্ম হোক আরও লাখো বীরভদ্রের! ম্লেচ্ছদের প্রত্যেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হোক। প্রত্যেক হিন্দুর, প্রতিটি বেদনায়—আকাশ বাতাস মথিত করে তাদের কণ্ঠ থেকে হাহাকার ঝরে পড়ুক। হিন্দুত্ব সংক্রান্ত প্রতিটি আন্দোলনের প্রাক্কালে তাদের হস্তদ্ধিত ধ্বজার অগ্রভাগ নীলাকাশ ভেদ করুক। আপাতত দেশদ্রোহী ম্লেচ্ছদের অস্ত্রে নিহত, হে হিন্দুবীরগণ। আমাদের কাছে তোমরা আজ শহীদ। আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করো আর আশীর্বাদ করো ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা যেন বিজয়ী হই, না হয় তোমাদের মত বীরগতি প্রাপ্ত হই।

সবাই হিন্দুদেরই উপদেশের 'ডোজ' গেলাচ্ছে—মনে হয় যেন দাঙ্গা হাঙ্গামা হিন্দুরাই শুরু করেছে! ভেন্ডিবাজার, ডোংগরী, বেহরায় পাড়া, সব মুসলমান মহল্লায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আমদানী করা অস্ত্রশস্ত্রে, দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে বৃদ্ধদের পর্যন্ত খুন করা হয়েছে। আবার ঐদিকে মুসলমান পুলিশ অধিকারী নিরীহ হিন্দুদের উপর গুলি চালিয়ে নিজেদের জাত ভাইদের প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করছে। মুসলমান যে কোন দেশেই থাক না কেন, যে কোন পদেই থাক না কেন, প্রথম সে মুসলমান তারপর সে ঐ দেশের নাগরিক! ধর্ম্ম, জাতভাই, ও রাষ্ট্র এই তিনের মধ্যে ধর্ম্ম বড়, জাত ভাই খুবই আপনজন আর রাষ্ট্রের কোন মানে নেই এরকম ব্যাখ্যাই ওদের মধ্যে লোকপ্রিয়। দুইদিন ধরে রাষ্ট্রনিষ্ঠ হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে এই আক্রমণ, বলতে গেলে রাষ্ট্রের উপরই আক্রমণ। "এই সরকার ভীরু" একথা সৎ ও দেশপ্রেমী পুলিশরা পর্যন্ত খোলাখুলি ভাবে বলছে। কোমরে রিভলবার ঝোলানো আছে কিন্তু ব্যবহার করা নিষেধ! শুধু দেশদ্রোহী মুসলমানদের হাতে প্রাণ দেওয়া 'ডেড বডি' তোলো আর গোনো। পুলিশরাও অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। সব কিছু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর এই ভীষণ পরিস্থিতিতেও আমাদের নপুংসক সরকার ঘোষণা করছে—'চুপচাপ ঘরে বসে থাক। ঘরে আগুন লাগালেও প্রতিকার করবে না, আমরা কার্ফু জারী করেছি।' ধিক্কার এই নপুংসক সরকারকে, মহারাষ্ট্র ও হিন্দুস্থানের মানুষ আজ এই নপুংসক সরকারের মুখে থুতু ফেলছে। সরকার সবুজ বোরখা পরে মুসলমান মহল্লায় হাতে চুড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকলেও লাখো হিন্দু যুবক চুপচাপ বসে থাকবে না। এই রাষ্ট্রকে বাঁচাবেই! রাষ্ট্র বিরোধী ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। আগামী দিন আমাদের—

সাবধান।

"সামনা"—চৌদ্দই জানুয়ারী ১৯৯৩

সাবধান

ধর্মান্ধ মুসলমানরা ধর্মের নামে যথেচ্ছাচার শুরু করল। তাদের এই যথেচ্ছাচারের বলি হয়ে হত্যাকান্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলো নিষ্পাপ সাধারণ হিন্দু নাগরিক। ভোটের লোভে গদীতে আসীন আত্মসম্মানহীন নেতারা ধর্মের নামে এই হত্যাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে থাকলো। কিন্তু হিন্দুরা রুখে দাঁড়াতেই এই রাষ্ট্র কর্তারা, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা ও দাঙ্গাকারী ধর্মান্ধ মুসলমানদের লেজ গুটিয়ে পালানো সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করল। মুম্বই শহরের হিংসার আগুন আস্তে আস্তে কমছে। ক'দিন আগেও তা আকাশ ছুঁয়ে ছিল। আমি শান্তি রক্ষার ডাক দেওয়াতে মানুষ এই আগুনে ইন্ধন যোগানো বন্ধ করলো। আর কিছুদিন এইরকম চলতে থাকলে এই শহরে আর একজনও ধর্মান্ধ দেশদ্রোহী মুসলমান অবশিষ্ট থাকতো না। তা দেখে "গফুর" ও "খানের" মত মুসলমান পুলিশ অধিকারীরা তাদের জাতভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। সরকারী অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা এই ধর্মান্ধ মুসলমানদের হিংসাত্মক কাজে সাহায্য করতে লাগলো। তাই বলে হিন্দুরা মার খায়নি। হিন্দুরা পিছে হটেনি। আপাতত আমরা শান্তি রক্ষা করছি। সব থামাচ্ছি। আসলে আমরা সহিষ্ণু কিন্তু তা বলে মার কত খাবো তারও তো একটা সীমা আছে! শুরু করেছে দেশদ্রোহী মুসলমানরা। হিন্দুরা প্রথমে চুপচাপ সহ্য করেছে কিন্তু প্রতিকার করতেই, নিজেদের সংগঠিত শক্তির প্রদর্শন করতেই দেশদ্রোহী মুসলমানদের সমস্ত আড্ডা অর্থাৎ মসজিদগুলোর উপর আত্মসমর্পণ করার সাদা নিশান উড়তে দেখা গেলো। তাই বলে গাফিলতি দেখালে বা উদাসীন থাকলে চলবে না। নিজেদের রক্ষার জন্য নিজেদের সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে। কারণ "খান" ও "গফুরের" মত পুলিশ অধিকারী সাধারণ মানুষের রক্ষার জবাবদারী ছেড়ে দিয়ে ধর্মান্ধ দেশদ্রোহী মুসলমানদের সাহায্যে ব্যস্ত থাকবেই তাই আগের চেয়েও বেশী সাবধান হতে হবে। বিনা কারণে, কিছু না করেও কেন মার খাওয়া বা মরা তাও আবার ঐ "খান" ও "গফুরের" মত ধর্মান্ধ পুলিশ অধিকারীদের হাতে?

মুম্বই আস্তে আস্তে শান্ত হচ্ছে। ধর্মযুদ্ধ আপাতত আমরা স্থগিত রাখছি। কিন্তু সরকার এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবে তার উপর ভবিষ্যৎ কার্য্য পদ্ধতি নির্ভর করছে এবং আমাদের এই শান্তিরক্ষা কতদিন চলবে, তাও। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার জামা মসজিদের ইমাম বুখারীর ছেলে সঈয়দ বুখারীকে মুম্বইতে পাঠালো। এই সঈয়দই দেশদ্রোহী "আদম সেনা" স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিদ্রাহীনতার কারণ হয়েছিল। সঈয়দ বিমান থেকে নেমেই শহর পরিদর্শনের জন্য তার প্রতিরক্ষায় মিলিটারী দেওয়া হোক বলে দাবী করে বসল। আমি

মুম্বই পুলিশ দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে তাঁরা ওকে শহরে ঘুরতে না দিয়ে দিল্লীতেই ফেরৎ পাঠিয়েছে। বিমানবন্দরের ভি. আই. পি. কক্ষ থেকে সঈয়দ টেলিফোনে পুলিশ অফিসার "খানের" সাথে যোগাযোগ করল। অথচ পুলিশ অফিসার শ্রী বাপট শহরেই ছিলেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ করল না। এই "খান" ও তার দলবল মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে অনেক রাষ্ট্রপ্রেমী হিন্দুদের হত্যা করেছে, এ আমি এর আগেও অনেকবার লিখেছি, আজও লিখছি। ইমামের ছেলের সাথে খানের কি কথাবার্তা হল তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর তা ছাড়া মুম্বই এর পরিস্থিতি এই রকম ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও সঈয়দকে এখানে কেন আসতে দেওয়া হল? কেন বাধা দেওয়া হল না? কারণ স্পষ্ট। ওকে বাধা দিলে মুসলমানরা কি মনে করবে? ইউসুফ খান ওরফে দিলীপ কুমার পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুবাইতে গিয়ে ক্রিকেট খেলবে বলে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য অনেক মহান শক্তি কাজ করছে। ইউসুফ ভাই আপাতত পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মুম্বই এর মুসলমান বস্তিগুলোতে গিয়ে তার ধর্মান্ধ জাতভাইদের মধ্যে উপদেশ দিক শান্তি স্থাপনের। আগে শহর, রাজ্য ও রাষ্ট্রের শান্তি স্থাপনের মহান কাজ করুক। জগতের শান্তি স্থাপনের চেষ্টা পরে করলেও চলবে। এই দাঙ্গায় সবার চোখ খুলেছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষমতা, নিজের নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ বুঝতে পেরেছে। বহু সংখ্যক হিন্দু নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। ক্ষমতাশীনদের ক্ষমতার নেশার ঘোর কেটে গেছে, বাকিদেরও অচিরেই কাটবে। কিন্তু এই ক'দিনে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিভাজনের সময়ের চেয়েও ভয়ংকর। এবারের দাঙ্গায় হিন্দুদের শক্তির পরিচয় পেয়ে দেশদ্রোহী মুসলমানরা নরম হয়ে থাকলেও আমাদের সব সময় তৈরী থাকতে হবে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। লেজ গোটানো রাষ্ট্র-কর্তা ও নেতারা নিজেদের নিজেদের প্রাণ ও ইজ্জত নিয়েই বর্তমানে ব্যস্ত। পরশু দিন শহাবুদ্দীন বিবৃতি দিল—'আমি মুসলমানদের নেতা নয়, আমি জনতা দলের নেতা'। যে মুসলিম লীগ গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলে আসছে মুসলমানদের সম্বন্ধে বলার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে, সেই মুসলিম লীগ ও তার নেতারা কোন গর্তে গিয়ে লুকিয়েছে খুঁজে পাচ্ছিনা। ইমামের ছেলেকেও বিমানবন্দর থেকেই ফিরে যেতে হল। হাজারো ধর্মান্ধ মুসলমান শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের আজকের এই অবস্থার জন্য দায়ী তাদেরই স্বার্থান্বেষী নেতারা। ধর্ম নিজের নিজের ঘরে, মসজিদে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমান নেতারা মুসলমানদের রাস্তায় আনলো আর তাতেই নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনলো। সেই নেতারা আজ অদৃশ্য। সরকারও অসহায়। মুম্বই আস্তে আস্তে শান্ত হচ্ছে। আমিও শান্ত আছি, কিন্তু আমার এই শান্ত অবস্থা কতদিন বজায় থাকবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সরকার ও দেশদ্রোহী মুসলমানদের কার্য্য-কলাপের উপর। ধর্মান্ধ মুসলমানদের ও তাদের লেজ গোটানো নেতাদের সাবধান করে বলছি—খবরদার হিন্দুদের বিরুদ্ধে আর লেগোনা—পরিণাম শোচনীয় হবে—সাবধান।

বোমা বিস্ফোটে অভিযুক্ত আসামীরা
এরা কোন্ জাতের?

Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Mustaq @ Ibrahim @ Tiger Abdul Rozak Memon
Ayub Abdul Razak Memon
Yakoob Abdul Razak Memon
Abdul Rashid Mohd. Khan
Salim Bismillah khan @ Salim Kurla
Shamshad
Sanjan Sunil Dutta
Mohd. Shoaib Mohd. Kasam Ghansar
Asgar Yusuf Mukadam
Abdul Gani Ismail Turk
Parvez Nasir Ahmed Shaikh
Bashir Ahmed Usman Gani Khairulla
Dawood @ Dawood Taklya Mohd.
Phanse @ Phanasmiya
Imtiyaz Yunusmiya Ghavate
Mohd. Usman Ahmed Jan Khan
Sharif Abdul Gafoor Parkar @ Dadabhai
Suleman Mohd. Kasam Ghavate
Ahmed Shah Khan Mubarak Shan @ Salim Khan Durani @ Salim Talwar
Asgar Ali Tahir Ali Masalawala
Aziz Ahmed Mohd. Ahmed Shaikh
Mohd. Iqbal Mohd. Yusuf Shaikh
Munna @ Mohd. Ali Khan @ Manojkumar Bhavarlal Gupta
Rashid Umar Alware
Sayed Abdul Rahman Shaikh
Shahnawaz Abdul Kader Qureshi
Shakil Suleman Hasham
Yusuf Khan @ Kayum Kasam Khan
Zakir Hussain Noor Mohd. Shaikh

Abbas Dawood Shaikh @ Shaikhdare @ Galkad
Abbas Hussain karel
Abdul Aziz Haji Gharatkar
Abdul Hamid @ Chuha haji Mohd. Birya
Abdul Khan @ Yakub khan Akhtar Khan
Akbar Khan Abu Sama khan
Ashfaq Kasim Havaldar
Firoz @ Akram Amani malik
Hanif Yusuf Kadawala
Mohd. Mustaq Moosa Tarani
Mohd. Jindran Mumtazali Jindran
Mohd. Rafiq @ Rafiq Madi Musa Biyariwala
Mohd. Shahind Nizamuddin Qureshi
Mohd. Yunus Rasool Botoniya
Moiddin Abdul Kadar Choruvattam
Nasim Ashraf Shaikh Ali Barmare
Noor Mohd. Haji Mohd. Khan
Salim Rahim Shaikh
Sarfaraj Dawood Phanse
Shaikh Ali Shaikh Umar
Sajjad Alam @ Iqbal Abdul Hamin Nazir
Abu Asim Azmi
Abdul Salam Nisamuddin nasir
Altaf Ali Mustaq Ali Sayed
Amjad Abdul Aziz Meherbux
Ashrafur Rehman Azimullah Shaikh @ Laloo
Faki Ali Faki Ahmed Subedar
Farooq Iliyas Motorwalla
Fazal Rehman Abdul Khan
Gul Mohd. @ Gullu Noor Mohd. Shaikh
Inayat Abdulla Sonde
Issaq Mohd. Hajwani
Ismail Abbas Patel
Majid Wali Mohd. Khan
Manzoor Ahmed Mohd. Qureshi
Ahmed Ibrahim khatib

Mohd. Sultan Sayed
Mohd. Dawood Mohd. yusuf Khan
Mohd. Hanif Mohd. Usman Shaikh
Mohd. Hussain Umar Merchant
Mohd. Jabir Abdul Latif Manssor
Mohd. Rafiq Usman Shaikh
Mohd. Sayed Mohd. Issaq
Ms. Mobina @ Baya Musa Bhiwandiwala
Sayed @ Mujju Ismail Ibrahim Kadri
Sayed Ismail Ali Kadri
Shabir Ali Khan
Shaikh Asif Yusuf
Shaikh Kasam @ Babulal Ismail Shaikh
Sikandar Issaq Hajwani
Ehsan Mohd. Tufel Mohd. Qureshi
Ayub Ibrahim Qureshi
Rusi Framrose Mulla
Abdul Aziz
Mohd. Iqbal Ibrahim s/o shaikh Ibrahim
Shah Nawaz Khan Faiz Mohd. Khan

* নামেরপাশে যে @ চিহ্ন আছে তার মানে ওরফে

"শান্তির বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে" (?)

"...... মুসলমানদের উপর রাগ করা হিন্দুদের কোন মতেই শোভা পায় না। ওরা যদি হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলেও না। হিন্দুদের উচিৎ ওদের তরবারির সামনে মৃত্যুবরণ করা। মরতে তো একদিন হবেই তাহলে মরণকে কেন ভয় করবো?"

"...... পাঞ্জাবে যারা মারা গেছেন তাদের খুন করা হয়েছে। তেমন কত লোক তো কলেরা বা অন্য কোন ব্যাধিতেও মারা যায়। যারা খুন করেছেন, তারা তো আমাদের মুসলমান ভাই ছাড়া আর কেউ নন।"

"...... কিছু লোক মিলিটারীর সাহায্যে রক্ষা পেয়েছে। একে কি রক্ষা পাওয়া বলে? যারা খুনী তারা তো আমাদের মুসলমান ভাই ছাড়া আর কেউ নন।"

মহাত্মা গান্ধী

(১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর দিল্লির বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর বক্তৃতার অংশবিশেষ)।

"সামনা"—দোসরা সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

খেলার মাঠেও ইসলামী আতঙ্ক

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কর্ণধার ইমরান খান তার মায়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে নির্মাণাধীন ক্যানসার হাসপাতালের সাহায্যার্থে লন্ডনে, হিন্দুস্থান বনাম পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিল ; কিন্তু প্রথম খেলাতেই পাকিস্তানের পরাভবের সম্ভাবনা দেখে প্রায় শ'দুয়েক লোক স্টেডিয়াম ছেড়ে খেলার মাঠে নেমে এসে মাঠ দখল করল। হিন্দুস্থানের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা পোড়ালো ও পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ঘোষণা দিয়ে খেলা বন্ধ করে দিল। সারা দুনিয়ায় ইসলামী আতঙ্কবাদীরা যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে তার এ আরএক উদাহরণ।

এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই—অনাকাঙ্খিত কিছুই ঘটেনি। যা ঘটবার মত তাই ঘটেছে ; কারণ এসব কাজ কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীরা করলেও এর পিছনে যে পাকিস্তানের হাত রয়েছে তা কারো অজানা নয়। পাকিস্তানের কাছ থেকে এ ধরনের ধর্মান্ধতা, জঘন্যতা ছাড়া অন্য কিছুর আশা করাই হাস্যকর। যে বৃটিশ, গণতন্ত্র ও ন্যায় সংস্থা স্থাপন করল সেই বৃটিশের দেশেই এ ধরনের ঘটনা ঘটলো আর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রানী এলিজাবেথ এ ব্যপারে মৌনতা পালন করলেন, এ অত্যন্ত দুঃখজনক। বৃটিশ, যে অখন্ড হিন্দুস্থানকে বিভাজন করে পাকিস্তানের জন্ম দিল সেই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা তাদের জন্মদাতা বৃটিশের আশীর্বাদেই খেলার মাঠে নিজেদের আসল চরিত্রের পুণঃ প্রদর্শন করল এবং আরও একবার পাকিস্তান আমাদের দেশকে, লন্ডনের ভূমিতে হেনস্থা করল। আমিতো এ বিষয়ে বছরের পর বছর ধরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে সবাইকে সাবধান করে যাচ্ছি, আমার প্রত্যেকটা কথা যে সত্য তা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও আমাদের খেলোয়াড়রা তার থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করছে না। ক্রিকেট আমিও ভালবাসি, ক্রিকেট খেলাকে ধর্ম ও রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা উচিৎ তাও মানি। কিন্তু ক্রিকেটের ময়দানে ইসলামী আতঙ্কের শয়তানী, এই যে বাধার সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে কেউ কিছু বলছে না। আমার স্পষ্ট মত—হিন্দুস্থান বনাম পাকিস্তান ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দিতা বন্ধ করতেই হবে। পাকিস্তান দলকে এদেশে আসতে দেওয়া হবে না, আমরাও ওদেশে যাবো না। পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও মাঠে পাকিস্তানের সাথে খেলবোনা। এ রাজনীতি বা ধর্মনীতি নয়, এটাই হিন্দুস্থানের ক্রীড়ানীতি হওয়া উচিৎ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতি যে কত সঠিক তা উপরোক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। 'পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের ও শিল্পীদের বর্জন করা উচিৎ নয়' বলে যারা নিজেদের উদারতার পরিচয় দেয় এ ঘটনায় তাদের গালে নিশ্চয়ই থাপ্পড় পড়েছে। লন্ডনের

ময়দানে সোমবারের এই গন্ডগোল হিন্দুস্থানকে আরেকবার থাপ্পড় মারার সামিল। তাই দুই বছর আগে 'পাকিস্তানী ম্যাচ মুম্বইতে হতে দেওয়া হবে না' বলে আমাদের শ্রী শিশির শিন্দের নেতৃত্বে শিবসৈনিকরা যে বানখেড়ে ক্রিকেট ময়দান ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল তা যে অযৌক্তিক ছিল না একথা আজ সবাইকে মানতেই হবে।

হিন্দুস্থানের কাছে পাকিস্তানী দল হেরে যাচ্ছে দেখে এই গন্ডগোল শুরু হল। পাকিস্তানের পরাভব তাও ঐ ঈদের দিনে। এ মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। এ হচ্ছে চিরস্থায়ী ঝগড়া। অনন্তকাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাকিস্তানের অন্ত না হওয়া পর্যন্ত চলবে বলে মনে হচ্ছে। পাকিস্তান, হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্তরে লাগাতার যে জাতক্রোধ দেখিয়ে চলেছে তা যদি দুই দেশের ক্রিকেট ম্যাচের সময় আরও তীব্রই হয় তাহলে এমন খেলা না খেলাই উচিৎ৷ পাকিস্তানের, হিন্দুস্থান-দ্বেষ এই ক্রিকেট খেলার নিমিত্তেও সবার সামনে প্রকাশ পেল। আমাদের খেলোয়াড়দের উচিৎ অর্থের লোভ ত্যাগ করা ও এদের সাথে খেলা বর্জন করা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতেরও উচিত পাকিস্তানের এই জঘন্য কাজের জন্য তাদের সাথে খেলা বর্জন করা—পাকিস্তানকে বয়কট করা।

হিন্দুর বিজয়, হিন্দুত্বের বিজয়

হিন্দু যখন একত্রিত হয়, সংগঠিত হয় তখন তাদের বিজয় সুনিশ্চিত—তা, সে, বাবরির বিষয়েই হোক বা পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের বিষয়েই হোক। সীমান্তের ওপারের শত্রু অর্থাৎ পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের হিন্দুস্থান সফর বাতিল করার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী ক্রিকেট নির্বাচক সমিতি নিতে বাধ্য হল ও সেই কথা ঘোষণা করা হল। তাছাড়া আর উপায়ও ছিল না। দমন শক্তির জোরে, জোর করে ওদের আসতে দিলে যে পরিস্থিতি ভয়ংকর খারাপ হবে সে কথা হিন্দুস্থান সরকারও বুঝেছে আর তা সময় থাকতেই। সময় থাকতেই বুঝেছে সেটাই বড় কথা। নির্বাচক সমিতির কর্মকর্তাদের পরামর্শ সরকার বাতিল করে দিয়েছে। শত্রুপক্ষের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার দায়িত্ব না নিয়ে সরকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ; কারণ না হলে সরকারকে অসুবিধায় পড়তে হত। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সম্বন্ধ এত খারাপ হয়েছে যে তা পুণর্গঠিত করা আর কোন রকমেই সম্ভব নয়। 'খেলা-ধূলার মাধ্যমে সম্বন্ধ আবার গড়ে উঠবে' এসব অত্যন্ত যুক্তিহীন ও বাজে কথা। খেলার মাঠেও যে দেশের খেলোয়াড়রা নামাজ পড়ে—আল্লার আশীর্বাদ চায় হিন্দুস্থানের সর্বনাশের জন্য, হিন্দুস্থানের কাছে হেরে যাওয়াকে ইসলামের পরাজয় বলে মনে করে, তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার আশা করা আর ভূতের মুখে রাম নাম শোনার আশা করা এক ব্যাপার। ইংল্যান্ড বা পাকিস্তান, দুবাই অথবা অষ্ট্রেলিয়ার যেখানে যেখানে হিন্দুস্থান বনাম পাকিস্তানের খেলা হয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় পাকিস্তানী খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকরা তাদের হিন্দুস্থান-বিদ্বেষ প্রকটিত করেছে। এমনকি তাদের সমর্থকরা আমাদের খেলোয়াড়দের মারধোরও করেছে। হিন্দুস্থান তাও সহ্য করেছে। কিন্তু এবার হিন্দুস্থানের এই বোমা বিস্ফোরণের ও দাঙ্গার পিছনে পাকিস্তানের হাত আছে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে খেলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত না।

শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ এর প্রতিবাদ করার, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল, তাই আমাকেই তা করতে হল। সাহসী শিবসৈনিক ও লাখো দেশপ্রেমী হিন্দুই হচ্ছে আমার শক্তি, তাদের ভরসাতেই আমি পাকিস্তানী দলকে সতর্ক করে দিয়েছি। কোন অন্যায় করেছি বলেতো আমার মনে হয় না। আজ সময় হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের বল না ছুঁড়ে কামানের গোলা ছোঁড়ার। পাকিস্তান আমাদের সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের জল্লাদরা প্রত্যহ কোথাও না কোথাও, কোন না কোন হিন্দু হত্যা করছেই। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে তাদের তান্ডব নৃত্য তো অনেকদিন ধরে চলছেই এবারে মুম্বইতেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাজারো নিরপরাধ নাগরিককে তারা হত্যা করেছে।

যে পাকিস্তান এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেই পাকিস্তানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার চিন্তা এবং চেষ্টা করাই যেখানে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা না করে সেই পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের জন্য 'রেড কার্পেট' অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। হজরতবাল দর্গায় যে সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকেছে তাদের ছাড়াবার জন্য পাকিস্তান সরকার জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে—এ থেকেই তাদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য বোঝা যায়। আমাদের, তাদের সাথে খেলারও প্রয়োজন নেই আর বন্ধুত্বেরও। তাদের খেলোয়াড়রা এদেশে আসবে আর এদেশের দেশদ্রোহীদের উত্তেজিত করবে, উৎসাহ যোগাবে, আর তারপর শুরু হবে মুসলমান মহল্লাগুলিতে পাক সমর্থকদের "উলঙ্গ নৃত্য" হিন্দুস্থানের পরাভব হলে ঐ মহল্লাগুলিতে শুরু হবে বাজী পোড়ানো, শুরু হবে আনন্দোৎসব! দেশদ্রোহীদের উৎসাহ যোগানোর এই জঘন্য খেলা এতদিন যা হয়েছে এবারে বন্ধ করতে হবে। শুধু পাকিস্তানই একমাত্র 'টিম' না, পৃথিবীতে আরোও অনেক দল আছে। এই উপলক্ষ্যে সরকারের নগ্নরূপ সাধারণ মানুষ দেখলো আর দেখলো দেশদ্রোহীদের। চিনলো দেশদ্রোহী কারা। এবার প্রয়োজন সেই দেশদ্রোহীদের বিষদাঁত ভাঙার। সর্বস্তরে হিন্দুদের জোটবদ্ধতা স্থায়ী হলে বিজয়ের দুন্দুভি বাজবেই বাজবে একথা আমি পুনরায় একবার প্রমাণ করে দিলাম।

"সামনা"—চব্বিশে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

আমরাও আশি কোটি

জামা মসজিদের শাহী ইমাম পুনরায় বিষোদ্‌গার করছে। এই সাপ যেন ফণা তুলতে না পারে, সময় থাকতে যদি সেই বন্দোবস্ত করা হত তা হলে দেশের পরিস্থিতি আজ এমন ভয়ঙ্কর হত না। কিন্তু কংগ্রেস থেকে শুরু করে জনতা দল পর্যন্ত সবাই দুধ কলা দিয়ে এই সাপকে পুষেছে। ইন্দিরা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পর্যন্ত সব প্রধানমন্ত্রী ইমামের সামনে হাঁটু গেড়ে হেঁট মাথা হয়েছে। জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পরের মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের সময় ইমাম, মসজিদ প্রাঙ্গনে বসে শর্তাবলী ডিক্‌টেইট করল আর ইন্দিরা গান্ধী নিজে হাতে তা লিখে নিল। সেই ইন্দিরা ভজনকারীরা আজ 'রাজনীতিতে যেন ধর্ম না আনা হয়' তার জন্য বিল পাশ করতে চলেছে। ইমাম বুখারী এই দেশকে অপমানিত করছে, এই দেশকে ঘুণ পোকার তৎপরতায় ভিতরে ভিতরে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে। এ দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত করে, তাদের সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সওদাবাজী করছে। ইমাম, দুদিন হল দিল্লির জামা মসজিদে এক বৈঠক ডেকেছিল। সেই বৈঠকে জনতা দলের সমস্ত উপদলগুলিকে আহ্বান করেছে একত্রিত হয়ে সংগঠিতভাবে হিন্দুত্বের মোকাবিলা করতে। সে আরও বলেছে—"উপদলগুলি সংগঠিত না হলে, একত্রিত না হলে, মুসলিম ভোট কাকে দেওয়া হবে সে বিষয়ে আগামী সাতই অক্টোবর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দেশের পঁচিশ কোটি মুসলমান ভোটদাতা উপেক্ষণীয় নয়। যতদিন পর্যন্ত নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রীর পদে আছে ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে না।" এ সব শুনলে কার না মেজাজ গরম হয়! পঁচিশ কোটি মুসলমানের ভোটের টোপ দিয়ে ইমাম আরও একবার দেশ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ফাঁদে আটকাতে চাইছে। এ অত্যন্ত ভয়ানক ঘটনা। যে ইমাম হিন্দুস্থানের জাতীয় পাতাকা পোড়ালো, প্রজাতন্ত্র দিবসে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস বর্জন করল, হিন্দুস্থানের সংবিধান মানে না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করল, দেশের পঁচিশ কোটি মুসলমান রাস্তায় নামবে বলে ভয় দেখালো। যার প্রত্যেক ধমনীর প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে রয়েছে হিন্দুস্থান-বিদ্বেষ ও রাষ্ট্রদ্রোহের বীজানু, সেই ইমাম বুখারী আর তার রাষ্ট্রদ্রোহী চেলা-চামুণ্ডারা আমাদের রাষ্ট্রকর্তাদের কোথায় নিয়ে যাবে? পঁচিশ কোটি (?) ভোটের লোভে যদি রাজকীয় নেতারা দেশদ্রোহী ইমামের সামনে নতমস্তক হয় তাহলে আমিও সতর্ক করে দিয়ে বলছি—আশি কোটি হিন্দু একত্রিত হয়ে ইমাম ও সেই রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক সমাধি না দিয়ে ছাড়বে না।

রাষ্ট্রবাদ না ইমামবাদ?

এই ইমাম, রাজনীতির, সমাজের ও দেশের সর্বনাশ করছে, তবুও রাষ্ট্র-কর্তাদের চোখ খুলছেনা। জামা মসজিদের এই ইমাম ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে জনতা পার্টিকে সাহায্য করল। এই রাষ্ট্রদ্রোহী ইমাম ১৯৮০ সালে জনতা পার্টির বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্য করল। ইন্দিরা গান্ধী গদীর লোভে তার একটার পর একটা দাবী মেনে নিচ্ছিল! টাইম্‌স পত্রিকার আর. কে. লকস্‌মন খুব সুন্দর ও অর্থপূর্ণ এক ব্যঙ্গচিত্র ঐ সময় টাইম্‌স পত্রিকায় এঁকেছিলেন। ব্যঙ্গচিত্র ছিল এই রকম—ইন্দিরা গান্ধী স্কুলের ছাত্রীর মত বসে আছে, ইমাম তাকে শর্তের মুসাবিদা বলে যাচ্ছে আর ইন্দিরা গান্ধী অনুগত শ্রুতি-লেখিকার মত সেই মুসাবিদা লিখে নিচ্ছে। ১৯৮৭ মার্চ মাসে দিল্লিতে বাবরি মসজিদ বিষয়ে মুসলমানদের এক মিছিল বেরুলো। সেই মিছিলের শেষের ভাষণে রাষ্ট্রদ্রোহী ইমামের নগ্নরূপ আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো। মহারাষ্ট্র টাইম্‌স পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সে বিষয়ে লেখা হয়েছিল—"এই লাগাম ছাড়া উন্মত্ত ইমামকে হিংসাপূর্ণ ভাষণ দেওয়ার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা উচিৎ। এই ইমাম মুসলমান মন্ত্রীদেরও ধম্‌কি দিয়েছে 'খবরদার, সতর্ক হও না হয় তোমাদের ঘরদোর লুটপাট করব, আগুন লাগাবো, হাত পা ভাঙবো'। পুলিশদের বিরুদ্ধেও একই শাস্তির ব্যবস্থা পত্র ঘোষণা করেছে। ...... সভায় উপস্থিত মুসলমানদেরও এই ভাষণ ভালো লাগছিল। ইমাম আরও ঘোষণা করল ; সরকার, ন্যায়ালয় এ সবের পরোয়া সে করে না। ন্যায়ালয় কংগ্রেসের গোলাম। সে দাবী জানালো বাবরি মসজিদের বিষয় দক্ষিণ ভারতের ন্যায়ালয়ে সোপর্দ করা হোক, আর সেই ন্যায়ালয়ে কোন হিন্দু বা মুসলমান ন্যায়াধীশ যেন না থাকে। এই দাবী মান্য করা মানে হবে, সরকারেরই ন্যায়াধীশ ও ন্যায়ালয়ের উপর অবিশ্বাস ব্যক্ত করা। এই দেশের রাষ্ট্রীয় ও ন্যায় পদ্ধতি যাদের মান্য নয় তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাক।" মহারাষ্ট্র টাইম্‌স এর সম্পাদক এ বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত লিখেছেন। আমি তাঁর সাথে একমত। আসল প্রশ্ন হচ্ছে এদেশে ইমামবাদ মুখ্য কি রাষ্ট্রবাদ? ইমামের মত রাষ্ট্রদ্রোহী শকুন, দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করছে আর আমাদের রাষ্ট্রকর্তারা সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে! এই সব জঘন্যতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াতেই হিন্দুরা, হিন্দু মহাসাগরের মত প্রচন্ড রুদ্ররূপ ধারণ করে অযোধ্যা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল আর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করল। পুলিশের বন্দুক আর দেশদ্রোহী ইমামের হুম্‌কি তারা পরোয়া করেনি। এদেশের হিন্দুরা রাম জন্মভূমি বিষয়ে একত্রিত হয়ে, সংগঠিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছে ও শক্তির প্রমাণ দিয়েছে, ইমামের পঁচিশ কোটি মুসলমানের দম্ভ বাবরি মসজিদের মতই বিধ্বস্ত করে ধূলিতে মিলিয়ে দিয়েছে। হিন্দুরা একজোট হয়ে যে ইমামরূপী বিষাক্ত নাগের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে, তার মাথা পা দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে সেই ইমামকে পুনরায় মাথা তুলতে দেওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক নেতারা আজ জামা মসজিদ প্রাঙ্গণে জমা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আজ শুধু এইটুকুই বলছি—ওরা পঁচিশ কোটি, খেয়াল রেখো আমরা কিন্তু আশি কোটি।

গোপন যুদ্ধ?

হিন্দুস্থানেই মুসলমানরা এক আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। মুসলমান নেতাগণ আর ইমাম ও মৌলা-মৌলবিরা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের স্ব-ঘোষিত নেতা। পাকিস্তানের সাথে সীমান্তে গিয়ে যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু হিন্দুস্থানের এই আভ্যন্তরীন গোপন রাষ্ট্র অত্যন্ত গুপ্তভাবে তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান সহ অনেক মুসলিম রাষ্ট্র এদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। ছয় ডিসেম্বরের দাঙ্গা, তার পরের বোমা বিস্ফোরণ, এ সব হচ্ছে আসলে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে গুপ্ত যুদ্ধেরই এক ভাগ। আর এ যুদ্ধের নেতৃত্ব যে ইমাম বুখারী করছে এখবরও আজ আর কারও অজানা নেই। আজ যে শুধু দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন তাই নয়, দেশের অস্তিত্বও নষ্ট হতে চলেছে। দেশ বিভাজনের সময় লাহোরে এক শ্লোগান সব সময় শোনা যেত—"হঁসকে লিয়া পাকিস্থান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।" পাকিস্তানের শাসক সেখানকার জনতা ও হিন্দুস্থানের মুসলমানরা বিগত অনেক বছর ধরে এই ঘোষণা কাজে রূপান্তরীত করার জন্য পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলমানরা এই ঘোষণা এখন বদলি করেছে। তারা এখন বলছে—"লড়কে লিয়া পাকিস্তান, হঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান"। এর মানে স্পষ্ট। হিন্দুস্থান সম্পূর্ণ জর্জরিত। ইমামের মত দেশদ্রোহীর ভোটের সওদার জালে ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক নেতারা আটকে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র প্রভাকর রাও, অর্জুন সিং, ভি. পি. সিং ও চন্দ্রশেখর বিভিন্ন দলের এই সব নেতারা পঁচিশ কোটি মুসলমানের ভোটের সওদা করতে ইমামের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছে। কাজেই এই সময় আশি কোটি হিন্দুকে আবার একবার নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে হবে। বিভাজনের সময় পাঞ্জাবে প্রচলিত ও লোকপ্রিয় এক কথা মনে পড়ছে। "অগ্গা শের দা, তে পিচ্ছা গিধর", মানে মুসলমানের সামনে কমজোর হলে বাঘের মত আক্রমণ করে কিন্তু নরম না হয়ে নির্ভয়ে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিকার করলে পাতিশিয়ালের মত পালায়। ভোটের জন্য যারা ইমামের পা চাটছে তারা ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আশি কোটি হিন্দুকে সংগঠিত হয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতেই হবে কারণ এদেশে ইমামবাদ চলবে কি রাষ্ট্রবাদ তার ফয়সলা করার সময় সন্নিকটে, সাবধান।

"সামনা"—বারোই অক্টোবর ১৯৯৩

রাষ্ট্রদ্রোহ, এই হচ্ছে ওদের ধর্ম

এদেশের মুসলমানরা সরকার ও দেশের সংবিধানকে পুনরায় একবার অপমান করল। এদেশের ন্যায়ালয়ে, আইন কানুন সব কিছুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুসলিম পার্শোনাল ল্য বোর্ড, দেশের সর্বত্র, সব প্রদেশে এমনকি গ্রামেগঞ্জেও 'ইসলামী ন্যায়ালয়" স্থাপন করার আদেশ জারী করল। পাঁচ রাজ্যে যখন নির্বাচন আসন্নপ্রায় তখন এই অসৎ প্রয়াস কেন, তা না বোঝবার মত হিন্দুরা আজ আর মূর্খ নেই। রাষ্ট্র শাসকদের মুখ থুতু দেওয়ার, তাদের ব্ল্যাকমেল করার এই রকম জঘন্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। ইসলামের বান্দারা দেশে সঙ্গীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে অথচ কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য বারের মত এবারেও নিঃশব্দ আছে। পরিস্থিতি এত সঙ্গীন হওয়া সত্বেও আমাদের, আত্মসম্মানহীন কংগ্রেস সরকারের নেতারা ভোটের জন্য মুসলমানদের পদলেহন করেই যাচ্ছে। এদেশের পরম্পরা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি যে মুসলমানরা ধূলায় মিলিয়ে দিচ্ছে, সংবিধান অবমাননা করছে সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলা এমনকি তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী কাজের প্রতিবাদ করাও আজ এদেশে অপরাধ বলে গণ্য হয়। যখন আমি মুসলমানদের এই রাষ্ট্র বিরোধী কাজের কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করি তখন আমাকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। প্রশ্ন জাগে—তাহলে এদেশ কাদের? ধর্ম যেমন মুসলমানদের আছে তেমন আমাদেরও আছে। কিন্তু দেশের প্রগতিমূলক কাজে আমরা কোনদিন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাধা সৃষ্টি করিনি। দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রথমে ভারতীয় ও পরে তার ধর্ম। বর্তমান আধুনিক যুগের সাথে খাপ খাইয়ে সবাইকে চলতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সবাইকে মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমান, হিন্দুস্থানকে নিজেদের দেশ বলে মান্যই করে না! এমনকি রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও পরম্পরা স্বীকার তো করেই না উপরন্তু এই সংস্কৃতি ও পরম্পরার কট্টর শত্রু হিসাবেই তারা নিজেদের জাহীর করে—কখনও সংস্কৃতি বিরোধী, কখনও সংবিধান বিরোধী কাজ-কর্ম, কখনও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এর শ্লোগান, আবার কখনও হিন্দুস্থানের প্রজাতন্ত্র দিনে কালো পতাকা উড়িয়ে নিজেদের দেশদ্রোহীতার পরিচয় তারা দেয়। নুন খাবে হিন্দুস্থানের আর গুণ গাইবে মুসলিম রাষ্ট্রের। মুসলমানদের এই রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্মীয় শয়তানীর কারণ জানতে হলে তাদের মানসিকতার বিশ্লেষণ আবশ্যক। তাদের এই ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তাদের ধর্ম থেকেই। ইসলামের ধর্মাজ্ঞা হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, এই হচ্ছে মুসলমানদের ধারণা। আর যেহেতু তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কাজেই তাদের আর কিছু জানবার বা শিখবার প্রয়োজন নেই ; এই হচ্ছে তাদের ধারণা। কেবলমাত্র হিন্দুবিরোধ এই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় তারা

কোনদিন রাষ্ট্রের অঙ্গ হবে না, এই রাষ্ট্রকে নিজেদের বলে মানবে না, কিংবা প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রবাহে নিজেদের মিশিয়ে দেবে না। তাদের ধর্ম্মীয় চিন্তা-ভাবনা ভিন্ন, সামাজিক দৃষ্টিকোণ ভিন্ন, রাষ্ট্রানুগত্য ভিন্ন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওদের চূড়ান্ত-সাধনাও ভিন্ন। এতদিন ধরে যে দেশে থাকছে, যে দেশের নুন খাচ্ছে, যে দেশের জলবায়ুতে প্রতিপালিত হচ্ছে সেই দেশের প্রতি যদি প্রেম না জন্মায়, সেই দেশকে নিজেদের বলে মনে করতে না পারে তাহলে তাদের দেশদ্রোহী বলা হবেনা তো কি বলা হবে? যতদিন পর্যন্ত ওদের এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন হবেনা ততদিন পর্যন্ত এই ভেদাভেদ, এই মতভিন্নতা বজায় থাকবে, আর আমাদের এই লড়াইও চালু থাকবে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় অনন্তকাল পর্যন্ত পরিস্থিতি এইরকমই থাকবে।

মুসলমানরা দেশের আইন মানবে না, সংবিধান মানবে না, ন্যায়ালয়কে সম্মান করবেনা তাহলে এই গলগ্রহকে দুধ কলা দিয়ে পোষা কেন? এরা এদেশ ছেড়ে চলে যাক। পাকিস্তানে যাক না হয় ইরান কিংবা আফগানিস্থানে চলে যাক। যে ইসলামী দেশে যেতে চায় চলে যাক—এদেশের সর্বনাশ আর না। ঘৃণা হয় কংগ্রেস সরকার আর জনতাদলের অসৎ নেতাদের কার্য্য পদ্ধতি দেখে। এদের মধ্যে একজনেরও সাহস নেই মুসলমানদের এই দেশদ্রোহী কাজের জন্য কড়া ভাষায় তাদের দুকথা শোনায়। এদেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রথমে ভারতীয়, তারপর তাদের ধর্ম একথা এরা কেউ বলছে না। তুষ্টিকরণ অনেক হয়েছে, মুসলমানদের ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখানকার মুসলমানরা ধরেই নিয়েছে যে "আমাদের ভোট ছাড়া কোন পার্টিই গদীতে বসতে পারবেনা।" আর এর জন্য দায়ী আমাদের রাষ্ট্র-কর্তারাই। মুসলমানদের দোষ দেওয়া বৃথা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যাওয়া হোক না কেন দেখা যাবে 'এক দেশ এক আইন'—অর্থাৎ সমান নাগরিক কায়দা ও অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশে আইন ও তার বন্ধন এ শুধু হিন্দুদের জন্য। মুসলমানদের জন্য সংবিধানও পরিবর্তন করা হয়। ন্যায়ালয়ের ন্যায় বিধির উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়। মানবকল্যাণের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক 'সতীদাহ প্রথা'র বিরুদ্ধে আইন পাশ করলেন হিন্দুরা তা মেনে নিয়েছিলো, অথচ এক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলা শাহাবানুকে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ীই ভারতীয় ন্যায়ালয় যখন তার ন্যায্য হক্ পাইয়ে দেওয়ার আদেশ দিল তখন মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আকাশ পাতাল এক করে ছাড়লো। উর্দু সংবাদ পত্রগুলি নানারকম ভাবে হিংসাত্মক প্রচার করতে লাগলো, এমনকি ভারতীয় সংবিধানও প্রকাশ্য ভাবে পোড়ান হ'ল। এসব এখনতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুস্থানে আলাদা ইসলামী ন্যায়ালয় স্থাপন করা মানেই দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও অখন্ডতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এ হচ্ছে ইসলামী ন্যায়ালয়ের বাহানা করে দেশে আরেকবার অরাজকতার সৃষ্টি করার জঘন্য ফন্দী। "এদেশে আমরা ভারতীয় পরিচয়ে নয়, 'মুসলমান' এই পরিচয় নিয়েই থাকবো"—

ইসলামী ন্যায়ালয়ের ঘোষণার পিছনে ওদের এই ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায়। তাই এই মুসলমানদের শেষবারের মত সতর্কীকরণ করাই যথেষ্ট নয়, এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, আর এদের পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে—"ধর্মান্ধ দেশদ্রোহী মুসলমানরা তোমাদের এদেশে স্থান নেই, তল্পিতল্পা গোটাও—পাকিস্তানে যাও না হয় বাংলাদেশে যাও, যেখানে খুশী যাও, যে স্বাধীনতা তোমরা এখানে ভোগ করছো পৃথিবীর কোথাও গেলে তার একভাগ স্বাধীনতাও তোমরা ভোগ করতে পাবে না। সেই স্বাধীনতার তোমরা অপব্যবহার করেছো এবং করছো। তোমাদের জাত নেই, পাত নেই, ধর্ম নেই। রাষ্ট্রদ্রোহ—এই হচ্ছে তোমাদের আসল ধর্ম। ইসলামী ন্যায়ালয় স্থাপনের ঘোষণা একথাই প্রমাণ করছে।"

হিন্দুরা চিরকাল আমাদের সংখ্যালঘু করে রাখতে পারবে না। কানাডার ইতিহাস দেখুন। কুইবেকের প্রশ্ন এল কেন? কুইবেকের নাগরিকরা ইংরাজ বংশধর এবং প্রোটেষ্টান্ট ছিলেন। প্রোটেষ্টান্টরা পরিবার পরিকল্পনা করতেন কিন্তু ওখানকার ফরাসী অধিবাসীরা ক্যাথলিক এবং কখনই তারা পরিবার পরিকল্পনায় অংশ নেন নি, এখনও নিচ্ছেন না। ফলে অল্পদিনের মধ্যে ফরাসী-ভাষী ক্যাথলিকদের সংখ্যা ইংরেজী-ভাষী প্রোটেষ্টান্টদের তুলনায় বেড়ে গেল। ফরাসী-ভাষী ক্যাথলিকরা তাদের নিজেদের দাবী ও স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। আমরাও সেই উদাহরণ অনুসরণ করবো। আজ না হোক, পঞ্চাশ বছর পরে, পঞ্চাশ বছরে না হয় একশত বছর পরেও এই দেশ ইসলামের জোয়ারে ভেসে যাবেই।

আলিগড়ের জনৈক অধ্যাপক

(ওরা করে লাভের হিসাব আমরা কষি লোকসানের অঙ্ক বই থেকে উদ্ধৃত
শ্রী সুকুমার নন্দী)
৩৯ পৃষ্ঠায়

সামনা"—চোদ্দই ডিসেম্বর ১৯৯৩

সবার জন্য সমান নিয়ম চাই

কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্লজ্জ কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কি ভাবে সমর্থন করে, তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদকে কিভাবে উত্তেজনা যোগায় তা গত সপ্তাহে আবার একবার আমরা দেখলাম। কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়মন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ লোকসভায় প্রতিশ্রুতি দিল সমান নাগরিক আইন, সংখ্যালঘুদের উপর চাপানো হবে না। সে আরও বলল দেশের সংখ্যালঘুদের মতামত না নিয়ে সংখ্যালঘুদের ব্যক্তিগত আইনে কোনরকম পরিবর্তন করা হবে না। 'সংখ্যালঘু' মানে যে মুসলমান, একথা আজ 'গাল টিপলে দুধ বেরোয়' এমন বাচ্চাও বোঝে। মুসলমানদের হিতার্থে কংগ্রেস সরকার সদা তৎপর। এই "সংখ্যালঘু" নামক ভূত দেশের ঘাড়ে চেপেছে। সেই ভূত গলা টিপে ধরলেও কিছু বলা হবে না, প্রতিবাদ করা হবে না, প্রতিকার করা হবে না এই হচ্ছে কংগ্রেসের নীতি। এই চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ পতাকাধারী ভূতের খেলায় দেশ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে ; তবুও হংসরাজ জোর দিয়ে বলছে মুসলমানদের ব্যক্তি আইনে (Personal Law)-র কোন রকম পরিবর্তন করা হবে না, আর করতে হলে মুসলমানদের অনুমতি নিয়েই তা করা হবে। একদিকে ভারতীয় সংবিধান, আইন কানুন ও গণতন্ত্রের মালা জপ করা হচ্ছে আর একদিকে দেশদ্রোহী মুসলমানদের খুশী করার জন্য সেই সংবিধানেরই বস্ত্র হরণ করা হচ্ছে! এসব একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত বলব আর কত লিখব। দেশের সংবিধান এরা মানবেনা, ন্যায়ালয় মানবেনা, পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ম মানবেনা, এদেশের সংস্কৃতিকে সম্মান করবে না, এমন কি এদেশকে নিজেদের দেশ বলেও মানতে রাজী না! তবুও আমাদের আইন তাদের কিছু করতে পারছেনা। পারবেনা—কারণ? —কারণ এদেশে সমান নাগরিক আইন নেই। দেশ একটা, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আইন আলাদা আলাদা। হিন্দুদের চলতে হবে সংবিধান মেনে, আর মুসলমানদের জন্য রয়েছে আলাদা 'পার্শোনাল ল্য'। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ছেচল্লিশ বছর। এই দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করছে। নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে, এই রাষ্ট্র তাদের ন্যায়। এখানকার আইন-কানুন, নীতি নিয়ম তাদের জন্য নয়। এদেশের সংবিধানও তারা মানে না। তাহলে এই বোঝা এদেশের উপর কেন? এদের এদেশে কেন থাকতে দেওয়া হচ্ছে? কাল হয়তো এরা দাবী করে বসবে—প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওদের জন্য আর একজন স্বতন্ত্র মুসলমান প্রধানমন্ত্রী চাই! তখন এই আইনমন্ত্রী হংসরাজ মাথা নুইয়ে সম্মতি দেবে। নাম হংসরাজ কিন্তু কার্য্য পদ্ধতি দাঁড় কাকের মত। এই হংসরাজ ছয়মাস আগে বলেছিল অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেসের নেতারা হর্ষদ মেহতার কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা

উৎকোচ নিয়েছে, ওর এই ভাষণের ভিডিও ক্যাসেটও আছে, তবুও পরে বক্তব্য অস্বীকার করল। আবার বলল 'এ আমার ব্যক্তিগত মত'। একটা দেশের কেন্দ্রীয়মন্ত্রী যে মত প্রকাশ করে তাকে ব্যক্তিগত মত মেনে নেওয়া সম্ভব? আর সবচেয়ে বড়কথা কংগ্রেসের নেতারাও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

পরিবার পরিকল্পনা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা অত্যন্ত আবশ্যক। পরিবার পরিকল্পনার নিয়ম-নীতি অত্যন্ত কঠোর ভাবে শুধু হিন্দুদের উপর চাপিয়ে হিন্দুদের সংখ্যা কম করা হবে আর দেশদ্রোহী মুসলমানরা গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা জন্ম দেবে এ পার্থক্য কেন? আইন কানুন মানবেনা, এর মানে কি? তাহলে হিন্দুরা কেন মানবে আইন? মুসলমানরা বলছে 'পরিবার পরিকল্পনা আমাদের ধর্ম বিরোধী' আমাদের সরকারের উচিৎ ওদের স্পষ্ট ভাষায় বলা—"অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে দেশের অর্থ-ব্যবস্থা জর্জরিত করা দেশের আইন বিরোধী"। পঞ্চাশ বছর পর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। হিন্দুর সংখ্যা কমবে আর মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে এমন হবে যে তখন 'লড়কে লিয়া পাকিস্তান, হঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান' তাদের এই ঘোষণা, এই স্বপ্ন, সফল করতে তাদের একটুও অসুবিধা হবে না। তাই বর্তমানে সবার আগে প্রয়োজন দেশে সবার জন্য সমান নাগরিক আইন চালু করে পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করা। এ এক বিচিত্র দেশ! আরও বিচিত্র এদেশের সরকার! কংগ্রেস সরকার বলছে—"আমরা ধর্মনিরপেক্ষ" অথচ যা কিছু করছে সব ধর্ম ভিত্তিক, বিভিন্ন ধর্মের জন্য আলাদা আলাদা। 'হিন্দু কোড বিল', এ শুধু হিন্দু মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি। সরকার যদি ধর্ম নিরপেক্ষই হয় তবে এ বিল থেকে মুসলমান মহিলাদের বাদ দেওয়া কেন? কেন 'হিন্দু স্ত্রী' ও 'মুসলমান স্ত্রী' এই আলাদা আলাদা শব্দ? সমাজের ও রাষ্ট্রের সব ধর্মের মহিলাদের দুঃখ এক রকম, তাদের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। ন্যায়ের মানদন্ড সবার জন্যই এক হওয়া উচিৎ। মুসলমানদের চার চারটে বিয়ে করার অধিকার আছে অথচ হিন্দুদের নেই ; একে কি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে? হিন্দুদের জন্য এক নিয়ম ও মুসলমানদের জন্য ভিন্ন, এই করেই সরকার দেশে ধর্মের দেওয়াল দাঁড় করিয়েছে। হংসরাজের মত মন্ত্রীরা এই দেওয়াল আরো অধিক পোক্ত করছে। মুসলমান মহিলাদের উপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে শাহাবানু রুখে দাঁড়ালো। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় শাহাবানুর পক্ষে রায় দিলে মুসলমানরা তা অগ্রাহ্য করল। তাদের খুশী করার জন্য সরকার আইন বদল করল! কিন্তু তার আগেই মুসলমানরা প্রকাশ্য রাস্তায় সংবিধান পোড়ালো। শাহাবানু দুঃখ কষ্ট বহন করে মৃত্যু বরণ করল। আর যারা দেশের সংবিধান পোড়ালো সেই দেশদ্রোহীরা বিনা শাস্তিতে ছাড়া পেলো। এই হচ্ছে এদেশের আইন! এদেশের সরকার! এদেশের বিচার!

আইনের সুন্নৎ

সংখ্যালঘু, মানে মুসলিম তুষ্টিকরণ এদেশে কত বেড়ে চলেছে রোজকার ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বোমা বিস্ফোরণ ও হজরতবাল-এর উদাহরণ-

চোখের সামনে রয়েছে। হজরতবালে ধৃত চরমপন্থীদের রোজ একজন একজন করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে! তার মানে এ আটক নয়,—নাটক। আগেই চুক্তি হয়েছিল ; তোমরা ধরা দাও পরে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ঐ চরমপন্থীদের শেষ করবার জন্য হজরতবাল দর্গায় কামান দাগাবার মত সাহস সরকারের নেই! মুসলমানরা কি মনে করবে! তারা মনঃক্ষুণ্ণ হবে!

এ সব একটার পর একটা ঘটনা মন বিষিয়ে যাওয়ার মত। এদেশের মুসলমানরা যদি শুধু নিজেদের ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ ও দেশের ন্যায় ব্যবস্থাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাহলে যে 'মুসলিম পার্শোনাল ল্য' এদের ঢাল, সেই 'পার্শোনাল ল্য' সম্পূর্ণ বাতিল করাই বর্তমানে যুক্তিযুক্ত। যতদিন পর্যন্ত "এক দেশ এক নিয়ম" এই নিয়ম চালু না হবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান নামক সংখ্যালঘুদের তুষ্টিকরণ এভাবেই চলতে থাকবে। কংগ্রেসের এই হংসরাজ আসলে 'হংস' নয়, 'দাঁড় কাক'। এই দাঁড় কাকের ইচ্ছা হয় নিজেকে 'সুন্নৎ' করে নিক, কিন্তু সত্তা ও ভোটের লালসে সংবিধান ও আইনের "সুন্নৎ" করা বন্ধ করুক।

আক্রমণ, এই হচ্ছে একমাত্র উপায়

"কাশ্মীরে অশান্ত ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার পাকিস্তানের সক্রিয় ও লাগাতার চেষ্টা হিন্দুস্থান কোন অবস্থাতেই সফল হতে দেবে না"—হিন্দুস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শংকর রাও চৌহানের এই বিবৃত্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে না যেতেই কাশ্মীরের কট্টর বিচ্ছেদকামীরা প্রতিবাদের তোপ দাগ্‌লো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কাশ্মীরের সরকার উচ্চপদাধিকারীদের নিয়ে এক হেলিক্যাপটার হেলিপেডে যখন নামছিল তখন ওখানকার দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা নিকটস্থ উচ্চ অট্টালিকা থেকে সেই কপ্টারকে লক্ষ করে প্রায় পনের মিনিট ধরে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি বর্ষণ করল। আর ঠিক ঐ সময়ে সীমান্তবর্তী সৈন্য শিবিরেও পাকিস্তান প্রচুর অগ্নী বর্ষণ করল। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুনরায় একবার সতর্ক বাণী আওড়ালেন—"এ সব সহ্য করা হবে না"। এই 'সহ্য করা হবে না'—মানে যে কি তা সাধারণ মানুষ আজকাল বোঝে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি আর কি সহ্য করা বাকি আছে? আর কাশ্মীরে আজ হিন্দুস্থানের স্বাভাবিক আইন শৃঙ্খলার কোন নামগন্ধ আছে কি? যেখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিক্যাপটার বিনা বাধায় নামতে পারে না সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীরে নির্বিবাদে নামতে পারে না এই ঘটনায় "কাশ্মীর ভারতের অবিভাজ্য অঙ্গ" এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে নাকি? সহ্যের সীমা ছড়িয়ে গেছে। আর কাশ্মীরও আমরা হারাতে বসেছি ; এই সত্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার শুধু 'সহ্য করা হবে না, দেখে নেবো, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে' এই ধরনের অর্থহীন ও নিষ্ফল বিবৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছে।

পাকিস্তান যখন সীমানা থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে তখন শুধু সতর্কবাণী আওড়ালে দেশরক্ষা হবে কি? পাক প্রতিনিধিদের সাথে ফালতু চর্চা অনেক বছর ধরে তো চলছে, তাতে কি লাভ হয়েছে? পাকিস্তান একদিকে আলোচনা চালিয়ে গেছে আর অন্য দিকে তাদের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী, তা সে নওয়াজ শরীফ হোক বা বেনজীর, সবাই "কাশ্মীরের জন্য হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে" যাওয়ার মত ভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছে। কাশ্মীর বিষয়ে কোন রকম আপোষ মীমাংসা করা অসম্ভব। পাক সরকার কাশ্মীরের কট্টর পন্থীদের অর্থ, অস্ত্র সহ অস্ত্র প্রশিক্ষণও দিচ্ছে এ কথা আমাদের সরকার প্রত্যহ বলছে আর তা প্রমাণিতও হয়েছে। একদিকে পাকিস্তানের চিহ্নমুদ্রিত বোমা কাশ্মীরে ও হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে আর একদিকে আমরা শুধু 'প্রতিবাদ পত্র' পাঠাচ্ছি। সন্ত্রাসবাদীদের কাজের চেয়ে নিজের লোকেদের এ উদাসীনতা অকর্মণ্যতা অসহ্য। আমাদের সৈন্য পাকিস্তানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সৈন্য শিবির আক্রমণ

করে সে সব কেন বিধ্বস্ত করছেনা? যদি সত্যি কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য অঙ্গ হিসাবে রাখতে হয় তা হলে পাকিস্তান আক্রমণ করা ও কাশ্মীরে পাক-সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যেক আশ্রয়স্থান বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করা এই হচ্ছে একমাত্র পথ। কাশ্মীরের রাষ্ট্রনিষ্ঠ হিন্দুরা আজ নিজেদের সম্পত্তি, সংস্কৃতি ও মন্দির সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বিসর্জন দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে, দিল্লি এবং অন্যান্য শহরের রাস্তায় রাস্তায় অথবা উদ্বাস্তু শিবিরে ভিখারীর মত জীবন-যাপন করছে। কাশ্মীর পন্ডিতদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আজ পাক সন্ত্রাসবাদীদের কব্জায়। অসংখ্য মন্দিরও ওরা ধ্বংস করেছে। এক হজরতবাল দর্গা বাঁচাবার জন্য ও তাতে লুকিয়ে থাকা দেশদ্রোহীদের নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসার জন্য হিন্দুস্থান সরকার পাকিস্তানী কট্টরপন্থীদের সামনে নত মস্তক হল অথচ এই সরকার কাশ্মীরের লাখো হিন্দু ও দেবদেবী সহ হিন্দুদের মন্দিরের ধ্বংস ক্রিয়া মুখ বুঁজে দেখলো। আবার নির্লজ্জের মত বলতেও ছাড়ছেনা, যে, 'কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য অঙ্গ'। এ হচ্ছে নিজেকে এবং দেশের জনগণকে প্রতারণা করা। কাশ্মীর আজ হাতছাড়া হতে চলেছে। সেখানকার প্রত্যেকটা ঘর আজ পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল একথা সরকার ভালো করেই জানে কিন্তু স্বীকার করার মত সৎ সাহস তাদের নেই। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করা। পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ও পৃথিবীর অন্য মহাশক্তি পাকিস্তানকে সাহায্য করবে এই ভয় অযৌক্তিক। রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর এদিকে আমেরিকা, মুসলিম রাষ্ট্র ইরাকের উপর আক্রমণ করে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন ইসলামী রাষ্ট্র একত্রিত হল না তখন, হিন্দুস্থান আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে এ চিন্তা ভিত্তিহীন। আর তা ছাড়া পাকিস্তানের মত দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে নাতো কি ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করবে? যা হওয়ার হবে, যে কোন পরিণামের জন্য তৈরী হতে হবে। সীমান্তের সৈন্যদের 'আগে বাড়ো' আদেশ দিয়ে কাশ্মীর বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে তবেই কাশ্মীর ভারতের অবিভাজ্য অঙ্গ থাকবে—না হয় কাশ্মীরে যে আগুন জ্বলেছে তা সমস্ত হিন্দুস্থানকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো সত্বেও যদি রাষ্ট্রকর্তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তাহলে জনতার উচিৎ এমন নপুংসকদের মুখে থুতু দেওয়া।

যে পাকিস্তানকে হিন্দুস্থান দুই দুই বার যুদ্ধে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়লো সেই পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করতে আমাদের সরকার কেন ইতস্তত করছে বুঝতে পারছিনা! পাকিস্তান যত লম্ফঝম্প করুক আর তাদের রাষ্ট্রকর্তারা কাশ্মীরের জন্য হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ভাষা ব্যবহার করুক তবুও হিন্দুস্থানের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তান কোন মতেই টিঁকবেনা একথা তারা নিজেরাও ভালো করেই জানে। কিন্তু 'বিশ্বাসঘাতকতা' এই হচ্ছে তাদের একমাত্র ভরসা। আর আজ আমরা তাই দেখছি, এখানকার মুসলমানদের ধর্মের দোহাই দিয়ে উত্তেজিত করা হচ্ছে! দেশদ্রোহীদের অর্থ

ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে হিন্দুস্থানে সতত অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই হচ্ছে পাকিস্তানের যুদ্ধনীতি। অস্থির হিন্দুস্থান মানেই স্থির পাকিস্তান। আজ কাশ্মীরে যে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ চলছে তা করছে কাশ্মীরের স্থানীয় মুসলমানরাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর গুলি পাকিস্তানী সৈন্যরা ছোঁড়েনি। ছুঁড়েছে পাকনিষ্ঠ কাশ্মীরি মুসলমান। সীমান্তে সৈন্যের চেয়ে সন্ত্রাসবাদী সংখ্যায় বেশী। আর এদের সাথে রয়েছে অসংখ্য আফগানের হিজবুল্লা কট্টরপন্থীরা। নিজেদের সৈন্যদের চেয়েও এই সব সন্ত্রাসবাদীদের উপর পাকিস্তানের ভরসা বেশী।

মজলিস নেতাদের 'দাদাগিরি'

দুইজন সুশিক্ষিত মুসলমানকে স্থানীয় মজলিস, রমজান এই উপবাসের মাসে হোটেলে গিয়ে আমিষ খাবার অপরাধে (!) অর্থদন্ডে দন্ডিত করেছে। শুধু তাই নয় এদের আমন্ত্রণকারী হিন্দুবন্ধুকেও গ্রাম ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছে। অন্ধশ্রদ্ধা, ধর্মান্ধতা ও তা থেকে সৃষ্টি মূর্খতার এ এক জ্বলন্ত উদাহরণ। কর্নাটকের মন্ডা জিলার নাগ-মংগলম শহরের এই ঘটনা ক্ষুদ্র হলেও উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মনিষ্ঠরা নিজের নিজের শ্রদ্ধা মত উপবাস করলে কারও আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু উপবাস ভঙ্গের অপরাধে মুসলমান নেতারা কাউকে মসজিদে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোগল আমলের সুবেদারের মত দন্ডের আদেশ দেবে এ কোন আইনে আছে?

শ্রী তাজিম পাশা এক কলেজের লেকচারার আর শ্রীমতি মশকত্ সেই কলেজের প্রিন্সিপাল। এক জন হিন্দু অধ্যাপক তাঁর অনেক দিনের বেতনের বকেয়া পেয়ে বন্ধু বান্ধবদের পার্টি দিয়েছেন আর সেই পার্টিতে শ্রী তাজিম পাশা ও শ্রীমতি মশকত্কেও নিমন্ত্রণ করেছেন। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের উপবাস ভাঙার দুরভিসন্ধি কারও ছিল না। পার্টিতে আমিষ খাদ্য ছিল। তাতে কোন অন্যায় হয়েছে, অনাচার হয়েছে, অধর্ম হয়েছে এ তাজিম পাশা ও শ্রীমতি মশকত্ মনেও করেন নি। কিন্তু কেউ গিয়ে মজলিসে নালিশ করেছে—'রোজার দিনে এই দুইজন মুসলমান কাবাব খেয়েছে'। বাস্। মজলিস নেতারা সেই হিন্দুসহ অন্য দুইজন তথাকথিত অপরাধীকেও মসজিদে ডেকে পাঠালো। সেখানে তাদের জবানবন্দী নেওয়ার পর বিচার হল! বিচারে তাজিম পাশার পাঁচ হাজার ও শ্রীমতি মশকতের তিন হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করে আদেশ দেওয়া হল আর ঐ হিন্দুকে আদেশ দেওয়া হল—গ্রাম ছেড়ে যেতে! সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সেই তথাকথিত বিদ্বানরাও মুখ বুঁজে সব মেনে নিলেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—এই তথাকথিত অপরাধের বিচার যখন চলছিল তখন সেখানে একজন কংগ্রেসের ও একজন জনতা দলের, দুইজন বহিরাগত উচ্চস্তরীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই বিচার সভায় যখন অপরাধীদের 'ধোলাই' করা হচ্ছিল তখনও ঐ নেতারা মুখ বুঁজে এ সব উপভোগ করছিলেন! মারধোর হয়েছে শুনে সেখানকার একজন পুলিশ সিপাহী, ওই ঘটনা, তার উর্ধ্বতন অফিসারকে জানায়। আশাদায়ক খবর এই যে মজলিস নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ, অপরাধের মামলা দায়ের করেছে। উপবাসের মাসে আমিষ খাওয়ার অপরাধে একজন নাগরিককে মসজিদে ডেকে নিয়ে গিয়ে এইভাবে মারধোর করার ও দন্ড দেওয়ার অধিকার এই মজলিস নেতাদের কে দিল? এ সাহস তারা পেলো কোথা থেকে? এ কি ন্যায়সঙ্গত? এসবের বিচার এবার ন্যায়ালয় করুক কিন্তু আপাতত আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যেসব পুলিশ কর্মীরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে তাদের যেন কোনরকম ক্ষতি না হয়।

"সামনা"—সতেরোই মে ১৯৯৪

হিন্দুরাও হাতে অস্ত্র নেবে

বিজয় সপকাল। এই চার বছরের শিশুকে ধর্মান্ধ মুসলমানরা জোর করে সুন্তা করল। চার বছরের শিশু। কারোর অহিত নিশ্চয়ই করেনি, কারো সাথে শত্রুতা করার মত বয়সও ওর না, আর কোন অপরাধ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। ইসলামী বিকৃতিতে মত্ত তিন ধর্মান্ধ মুসলমান তরুণ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্রেড দিয়ে সুন্তা করল। এই ঘটনা ঘটল বুলঢানা জিলার চিখ্‌লি গ্রামে, মহারাষ্ট্রে ; হিন্দু স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী মাহারাজের জন্মভূমিতেই। চার বছরের শিশু বিজয়, ভীত—হতবাক। "আমাকে গোয়াল ঘরে নিয়ে গেল, আমার হাত পা ধরে রাখল তারপর কাটলো।" কিন্তু কেন? সব কিছু বোঝার মত বয়স তার এখনও হয়নি। ঐ গ্রামেরই শেখ-খলিল, সেলিম ও শেখ মুজফ্‌ফর এই তিন নররাক্ষস এই জঘন্য কাজ করেছে। বিজয়ের বাবা চিখ্‌লি খানায় অভিযোগ দাখিল করতে গেলে থানার পুলিশ অধিকারী শেখ চাঁদ সাত্তার অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে অস্বীকার করল। পুলিশ অধিকারী শেখ চাঁদের এই কাজের বিরুদ্ধে ও ঐ তিন ধর্মান্ধ মুসলমানের গ্রেপ্তারের দাবী নিয়ে শিবসৈনিকরা চিখ্‌লি থানায় গেলে তাদেরও ভয় দেখানো হল ; "চুপচাপ বস, নয়তো তোমাদেরই আটক করব।" কিন্তু শিবসৈনিকদের ও বিক্ষুব্ধ জনগণের আন্দোলনের চাপে শেখ সাত্তারকে নতি স্বীকার করতে হল। অভিযোগ লিখে তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারও করা হল। কিন্তু শেখ সাত্তার অভিযুক্তদের জামিনে বের হওয়ার ব্যবস্থাও করল সঙ্গে সঙ্গে। আজ ঐ তিন মুসলমান নরাধম মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন হিন্দু-শিশুর সুন্তাকর্ম সফল হল। হিন্দুরা কিছু করতে পারলোনা তারপর আরও করার সাহস বাড়বেই। অপরাধী মুসলমান, কোতোয়াল মুসলমান, চিখ্‌লিতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দুরা সংখ্যালঘু, এই সুন্তার ঘটনার পর সেখানকার মুসলমানরা প্রচন্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। যে বিজয়ের সুন্তা করা হয়েছে তাদের পরিবারও ভয়ে, আতঙ্কে আটদিন পর্যন্ত মুখ খোলেনি। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মহারাষ্ট্রে ধর্মান্ধ মুসলমানদের আতঙ্কে হিন্দুদের ঘরে লুকিয়ে থাকতে হয় তবুও কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী ও অন্য নেতারা নির্লজ্জের মত প্রচার করে বেড়ায়—এ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র! আরে—এ কেমন ধর্ম নিরপেক্ষতা? দুগ্ধপোষ্য হিন্দুর ছেলেকে জোর করে সুন্তা করা হয় আর থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে সুন্তা করা পুলিশ অধিকারী অভিযোগ নিতেও অস্বীকার করে! অপরাধী দুই ঘন্টার মধ্যে মুক্তি পায়। এই হচ্ছে কংগ্রেসের রাজত্বে সুন্তা করা ধর্ম নিরপেক্ষতা অন্যের ধর্মের উপর আক্রমণ করে আবার "আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে" বলে যারা অযথা চেঁচামেচি করে বেড়ায় তাদের হাত পা বেঁধে জ্যান্ত কবর দেওয়াই উচিৎ। কতদিন সহ্য করা হবে, এসব অরাজকতা? হাতে বন্দুক ও তলোয়ার নিয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণকারী, হাতে ব্লেড নিয়ে হিন্দু শিশুর সুন্তকারী নরাধম ইসলামীদের শায়েস্তা করার সাহস যদি সরকারের না থাকে তাহলে এখন থেকে হিন্দুরা হাতে অস্ত্র নিয়ে এই রাষ্ট্রদ্রোহী নরাধম মুসলমানদের মোকাবিলা করবে। চিখ্‌লিতে ধর্ম নিরপেক্ষতার সুন্তা করে ধর্মান্ধরা হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা, অখন্ডতা নষ্ট করার নূতন ফন্দী আঁটছে। তাদের এই ফন্দী চিখ্‌লির মাটিতে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। রাষ্ট্র কর্তাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয়ে থাকলেও হিন্দুদের হিন্দুত্ব টিকে আছে—টিকে থাকবে। আর সেই হিন্দুত্বই চিখ্‌লি থেকে শুরু করে ভেন্ডিবাজার পর্যন্তসমস্ত মুসলমান বস্তিতে মুসলমানদের এই ধর্মান্ধ জঘন্য তান্ডব নৃত্য বন্ধ করবে।

দেশদ্রোহীদের জন্য শোক

পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিয়ে বিধান সভায় যে মরাকান্না কাঁদা হল তা দেখে মহম্মদ আলি জিন্না ও জুলফিকর আলি ভুট্টোর আত্মাও বোধহয় আশ্চর্য্যচকিত হয়েছে। ঐ দুই হিন্দুস্থান বিদ্বেষীরা তাদের নিজেদের দেশের মুসলমানদের বিষয়েও এত মনোযোগী ছিল না যত তত্ত্বাবধান আজ এই কংগ্রেসীরা (আর পশ্চিম বাংলায় লাল ভাইরা) মুসলমানদের করছে। এরা সমষ্টিগত ভাবে ছুন্নত করেছে নাকি এদের আক্কেল বুদ্ধি সব ইমামের পায়ে সমর্পণ করেছে তা এরাই জানে। সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান 'আমি অত্যন্ত গোঁড়া' এই প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অন্য সকলের চেয়ে উচ্চস্বরে আল্লা-আল্লা করে—এদের অবস্থাও হয়েছে সেই রকম। তবে রাষ্ট্রদ্রোহী অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিয়ে এরা যে মরাকান্না শুরু করেছে তার প্রতিবাদ হিন্দুস্থানের সমস্ত রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষের করা উচিৎ। 'আমার গায়ে হাত তুললে সেই জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে' এই কথা কি আজ আমি প্রথম বলছি? এর আগে অনেকবার বলেছি তা-বিভিন্ন সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। শরৎ পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই প্রসঙ্গ অনেকবার এসেছে; আর আমি তাতে কোনরকম অন্যায় করেছি বলেতো মনে হয় না—কারণ পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার, দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করার জন্য বদ্ধ পরিকর। কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী কারা? দিল্লীর বোমা বিস্ফোরণের পেছনে কারা রয়েছে? ত্রিপুরা, আসামে যে অশান্তি চলছে, এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে। আর মুম্বাই এর দাঙ্গা এবং বোমা-বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে কার সহযোগিতা?—এই সব প্রশ্নের উত্তর এক শব্দে দেওয়া যায়, তা হল পাকিস্তান। হিন্দুস্থানে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের মধ্যে রয়েছে I. S. I. এর লোক। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা I. S. I. এর হাত রয়েছে এই সব ঘটনার পেছনে! আর সেই রাষ্ট্রদ্রোহী হাত সমূলে উপড়ে ফেলা উচিৎ নয় কি? আর সেই হাত যদি আমার উপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে আমার অনুগত শিব-সৈনিকদের অভেদ্য কবচ কুণ্ডল সেই হাত তো গুঁড়িয়ে ফেলবেই আর সেই আক্রমণকারী পাকিস্তানী হোক কিংবা বাংলাদেশী, সেই জাত হিন্দুস্তানে ওষুধ দেওয়ার জন্যও অবশিষ্ট থাকবে না—এই ঘোষণা আমি এর আগেও অনেকবার করেছি এবারে আর একবার করলাম; কারণ শিবসেনা, বি.জে.পি. সংযুক্ত সরকার মহারাষ্ট্রের গদিতে বসবার পর অনুপ্রবেশকারীদের যখন আমি কঠোর ভাবে সতর্ক করে দিলাম তখনই কোন এক পাকিস্তানী, বাংলাদেশী উগ্রপন্থী আমায় মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিল এই

অবস্থায় আমার কি করণীয়? চুপ করে বসে থাকা? তার মানে ওরা ওদের "ফিল্ডিং" লাগিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করা পর্য্যন্ত আমরা কিছু করব না? এই ধরনের চিন্তাধারা আমার মতে নপুংষকত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যাদের তা পছন্দ তারা তা মেনে নিক। আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি প্রতিকার করবই। আর আমার শিব-সৈনিকরাও করবে। বিধান সভায় দেশদ্রোহী পাকিস্তানী, বাংলাদেশী মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে চেঁচামেচি করে এরা নিজেদের দেশদ্রোহীতার প্রমাণ দিল। দেশের মানুষ এদের এই কার্য্য পদ্ধতির জন্য একদিন এদের উপর থুতু ছুঁড়বে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এতে সংখ্যালঘুদের উদ্বিগ্ন বা ভয়-ভীত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহর যোশী বিধান সভায় পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছেন যে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু এই শব্দগুলি আমরা মুছে ফেলতে চাই। এত পরিষ্কার করে বলার পরেও আবার চেঁচামেচি কেন? একজন বলে বসল 'পানীয় জলের সমস্যার চেয়েও এই বিষয় আমাদের কাছে বেশী মহত্বপূর্ণ'! বাঃ! তার মানে লোক পানীয় জলের অভাবে গলা শুকিয়ে মরুক কিন্তু যে প্রচণ্ড সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এই পানীয় জলের সমস্যা সৃষ্টি হল সেই অনুপ্রবেশকারীদের আমরা গলা জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করব! কি জন্যে? না ভোটের লালসায়! এই দেশের আসল নাগরিকদের চেয়ে এই দেশদ্রোহী অনুপ্রবেশকারীরা এদের কাছে আপনজন। মুম্বাইতে আজ বিয়াল্লিশ হাজার অন্যদেশী নাগরিক বেআইনি ভাবে আছে, একথা প্রমাণিত হয়েছে। (আসল সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী-অনুবাদক) এরা সব এসেছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে। এরা বিধান সভার নির্বাচনে ভোটও দিয়েছে, কি অধিকার এদের এদেশের সরকার নির্বাচনের? সমস্ত মোহল্লায় মোহল্লায় এরা ছেয়ে গেছে, এরা আছে I. S. I.-র ছত্র ছায়ায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওরা যে দেশদ্রোহী কাজ করছে, বারবার প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসীরা ও অন্য 'সেক্যুলার বাদীরা' দেশদ্রোহীদের 'সংখ্যালঘু' লেবেল লাগিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে; দেশের ভবিষ্যৎ-এর কথা চিন্তা না করে!

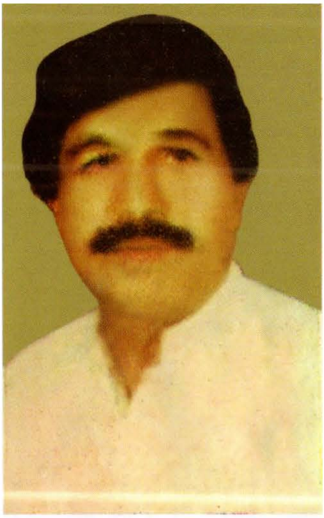
১৯৪৯ সালে মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনদেশে সাম্যবাদী রাষ্ট্র শাসন প্রণালী শুরু হল। মুসলমানদের উপর অনেক বাধা নিষেধ লাঘব হল। চীনদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হল সত্য কিন্তু যে নীতি বা যে ধর্ম দেশের ও দেশের সরকারের চেয়েও অন্যের উপর বেশী নিষ্ঠা রাখার শিক্ষা দেয়—তাকে সাম্যবাদী সরকার মেনে নেয় না। সাম্যবাদী চীনদেশ মুসলমানদের সংখ্যালঘু নামে পৃথক ভাবে অভিহিত করেনি। শুধু মুসলমান কেন কারো পৃথক অস্তিত্ব চীন স্বীকার করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চীনে মুসলমানের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটী। চীন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা এককোটী। (হিন্দুস্থানে ১৯৪৭ সালে ছিল সাড়ে তিন কোটী আর এখন ....?) ১৯৫২ সালে মুসলমান বহুল

রাজ্য কান্সুতে বিদ্রোহ হল ; সেই থেকে চীন সরকার মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে শুরু করল। মুসলমানদের পশু বধ কেন্দ্র বন্ধ করল। স্কুলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা বন্ধ করা হল। আরবি ভাষা নিষিদ্ধ হল। রাশিয়ায়ও একই রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হিন্দুস্থানে এসব ঘটেছে কি? নাকি আমরা কোন দিন দাবী করেছি? ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটী আর আজ দাঁড়িয়েছে পঁচিশ কোটী! মসজিদ মাদ্রাসা গলিতে গলিতে বেড়েই চলেছে। শিবসেনা-বি.জে.পি. সরকার মহারাষ্ট্রে গদীতে বসায় মুসলমান হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কি? নাকি তাদের ছেলে-মেয়েদের বিনা কারণে জেলে ঢোকান হয়েছে? নাকি তাদের মসজিদের উপর বুলডোজার চালান হয়েছে? এসব কিছু না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অযথা চেঁচামেচি কেন? কেন এই অসৎপন্থা অবলম্বন? আমাদের সরকার গঠন হওয়ার পর ডাঃ রফিক ঝাকেরিয়া, এ. ওয়াই. শেখ, এম. এ. আজিজ ও মুসলমান সমাজের আরও সম্মানিত ব্যক্তিরা এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদেরকেও আমি স্পষ্টভাবে বলেছি "মুসলমানদের উপর অযথা অন্যায় হবে না"। তারা আমায় বলেছেন, "বালাসাহেব পাকিস্তান নির্মাণ হওয়ায় মুসলমানদেরই ক্ষতি হয়েছে বেশি, তাই হিন্দুদের চেয়ে হিন্দুস্থানের মুসলমানরাই বেশী পাকিস্তান বিরোধী, পাকিস্তান নির্মাণের পক্ষে মত দিয়ে মুসলমানরা আজ অনুশোচিত"। এই মুসলমানদের এখন উচিৎ এগিয়ে এসে এই সব দেশদ্রোহী কার্য্যকলাপের নিন্দা করা। 'সব মুসলমানরা রাষ্ট্রদ্রোহী' একথা আমি কোন দিন বলিনি। রাষ্ট্রপ্রেমী মুসলমানরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করুক আর পাকিস্তান-বাদী মুসলমানরা যখন যখন এই দেশে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে তখন তখন তাদের কাজের নিন্দা করুক, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। 'সংখ্যালঘু' সমাজ বলে কোন শব্দ নেই। সমাজ দুটো—নিরপরাধী এবং অপরাধী সমাজ। রাষ্ট্রপ্রেমী মুসলমান নিরপরাধী নিষ্পাপ। আর পাকিস্তানী, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী অপরাধী। আর যারা তাদের সমর্থন করবে তারাও অপরাধী। তারা দেশদ্রোহী বলেই গণ্য হবে।
............এই সব বিদেশী অনুপ্রবেশকারী শুধু কেবল মুম্বাই বা মহারাষ্ট্রেই নয় হিন্দুস্থানের যেথায় যেথায় আছে খুঁজে বের করে তাড়াতেই হবে। এদের আতিথ্য করার জন্য এদেশ কোন ধর্মশালা নয়। তাই স্পষ্ট ভাষায় আবার বলছি এই সব অনুপ্রবেশকারীদের বিতারিত করার আমাদের যে সিদ্ধান্ত তা আমরা কার্যান্বিত করবই, আর তা করতে গেলে যে কেউ আমার উপর আক্রমণ করবে তাকে বা তাদের নিশ্চিহ্ন করব। তুষ্টিকরণ অনেক হয়েছে। এবার কঠোর হতে হবে। সবার আগে দেশের স্বার্থ। প্রাণের মায়া আমি করিনা, কেউ 'মেরে ফেলবো' বলে হুমকি দিল, ভয় দেখাল—আমি তাতে ঘাবড়াই না। তবে এও ঠিক, সে ধরণের কোন চেষ্টা হলে যে বা যারা সেই চেষ্টা করবে সে বা তারা যে জাতের, যে মতের হোক পার পাবে না ; কারণ তারা দেশদ্রোহী। 'সংখ্যালঘু'র ধূয়ো তুলে যারা আজ পাকিস্তানী, বাংলাদেশী মুসলমানদের পক্ষ নিচ্ছে সেই সব নির্লজ্জ

কংগ্রেসীদের প্রশ্ন করছি দিল্লীতে শিখ দ্বারা যখন ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা হল তখন দিল্লী সহ সমস্ত দেশের শিখদের হত্যা কাণ্ডের নেতৃত্ব তোমরা অর্থাৎ এই নরাধাম কংগ্রেসীরাই করেছিলে না? দিল্লীতে নির্বিচারে হত্যা করা হল শিখদের। তাদের রক্তে দিল্লীর মাটি লাল হল, কোথায় ছিল তখন তোমাদের এই মানবতা বোধ? কিন্তু সেই সময় মুম্বাইতে-মহারাষ্ট্রে শিখদের বাঁচিয়েছি আমরা, আমি করেছি তাদের সংরক্ষণ। আমার সামান্য অঙ্গুলি নির্দেশেও শিখ সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারত, রক্ত নদী বইতো, কিন্তু আমি তা হতে দেইনি ; কারণ ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার জন্য সারা শিখ সমাজ দায়ী ছিল না। তাই তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জৈল সিং মুম্বাইতে এলে করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে ভারী গলায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন—"বালাসাহেব একমাত্র আপনার জন্যই এখানকার শিখ সমাজ রক্ষা পেয়েছে"। শিখরা সংখ্যালঘু না? সেই সংখ্যালঘুদের হত্যকাণ্ডের নিন্দা তোমরা করেছিলে কি? তোমাদের 'ম্যাডাম' কে মেরেছে তাই শিখেদের হত্যাকাণ্ডে যদি তোমরা প্রোৎসাহন যোগাতে পার, তাদের হত্যা করতে পার ; তাহলে আমার উপর যারা আক্রমণ করবে তাদের কি করা উচিৎ? ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করা উচিৎ? গান্ধীজীর হত্যা করল পণ্ডিত নাথুরাম গোড্‌সে দিল্লীতে। নাথুরাম গোড্‌সে জাতিতে ব্রাহ্মণ তাই মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের নির্বিচারে হত্যা করা হল, ব্রাহ্মণদের ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট জ্বালান পোড়ান হল। বাড়ীর মহিলারা হলেন বলাৎকারের শিকার। আর এই "পুণ্যকৃতের" নেতৃত্বে ছিলে তোমরা এই কংগ্রেসীরাই। —তোমাদের জঘন্যতার উদাহরণ আর কত দেব?

তাই এই কংগ্রেসীদের (আর তার সাথে এই অনুপ্রবেশ-প্রসঙ্গে যারা তাদের সমর্থন করছে—পশ্চিমবাংলার সেই লাল ভাইদের) বলছি—দেশের স্বার্থে আমি যা বলছি বুঝতে চেষ্টা কর। আর যদি বুঝতে না চাও তবে কর আমার বিরোধ—কর আক্রমণ। কিন্তু খেয়াল রেখো—পার পাবে না। অনুপ্রবেশকারীদের তো তাড়াবই তার সাথে তোমাদেরও কবর দেব ঐ জিন্নার কবরের পাশে।

আজ এই পর্য্যন্তই—।



আমার জন্ম তদানীন্তন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের এক গ্রামে।... হয়তো দুপুরের ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক বেয়ে ঝুপ করে হোতো বিকেল, তার পরেই হয়তো বিকেলের বৃন্তে ফুটতো রাত্রি সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে। ঠাকুমার কোল ঘেঁসে শুয়ে "রাজকুমারী" — "সোনারকাঠি" — "রূপোরকাঠি"-র কথা শুনতে শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তাম।

কখন যেন এলো দুঃসময়—"এলো দস্যুর দল"— এলো মুসলিম লীগ,... "কাঁটা মারা জুতোর তলায়" ছিন্নভিন্ন করল সেই গ্রাম। ঠাকুমার কাঁধে চেপে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে আমাদের নূতন নামকরণ হল— "বাস্তুহারা"...

শান্তি দত্ত

আমি বাল ঠাকরে বলছি।